চাঁদমামা
মার্চ ১৯৭৪
1 Re

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন ও স্ক্যান করেছেন : ঝাড়গ্রাম ডেভিলস

এডিট করেছেন : সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optimcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

Photo by: **P. V. SUBRAMANYAM**

পেটের গোলমাল?
সে আবার কি বাপু?
কোনদিন শুনিনিতো!
ডাবর
গ্রাইপ
ওয়াটার
প্রত্যেক মায়ের কাছে
তার শিশুর মতন প্রিয়
শিশুদের বদহজম, অম্বল,
পেটব্যাথা, বায়ু, ও দাঁতউঠার
সময় ব্যাথার
একটি সুস্বাদু
সুনিশ্চিত
সমাধান
GRIPE
WATER
ডাবর (ডাঃ এস. কে. বর্ম্মন) প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-২৯

আমাদের
সবার ভাল লাগে
চাঁদমামা
চাঁদমামা
তোমারও লাগবে
ছোট বড় সবাই চাঁদমামা ভালবাসে।
পত্রিকাটি বেরোয়—বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দী, মারাঠী,
গুজরাতী, তেলুগু, কন্নড, তামিল, মালয়ালম্
আর ইংরেজী মোট দশটি ভাষায়।
মন ভুলানো ছবি আর গল্পেতে ঠাসা।
চাঁদমামা ছোটদের মাসিক পত্রিকা—
কত ছোট হবে বড়, কত বড় হবে ছোট।
আজকেই চাঁদমামা কেনো।

চাঁদমামার গ্রাহকদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

আপনি যদি নিজের ঠিকানা বদলাতে চান তাহলে পাঁচ তারিখের মধ্যে গ্রাহক সংখ্যাসহ আপনার নতুন ঠিকানা আমাদের জানান। দেরি করলে পরের মাস থেকে নতুন ঠিকানায় 'চাঁদমামা' পাঠাব। আপনার সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

ডলটন্ এজেন্সীস
চাঁদমামা বিল্ডিংস
মাদ্রাজ-৬০০ ০২৬

Statement about ownership of CHANDAMAMA (Bengali)
Rule 8 (Form IV), Newspapers (Central) Rules, *1956*

1.	*Place of Publication*	'CHANDAMAMA BUILDINGS' 2 & 3, Arcot Road Vadapalani, Madras-600 026
2.	*Periodicity of Publication*	MONTHLY 1st of each calendar month
3.	*Printer's Name*	B. V. REDDI
	Nationality	INDIAN
	Address	Prasad Process Private Limited 2 & 3, Arcot Road, Vadapalani Madras-600 026
4.	*Publisher's Name*	B. VISWANATHA REDDI
	Nationality	INDIAN
	Address	Chandamama Publications 2 & 3, Arcot Road, Vadapalani Madras-600 026
5.	*Editor's Name*	CHAKRAPANI (A. V. Subba Rao)
	Nationality	INDIAN
	Address	'Chandamama Buildings' 2 & 3, Arcot Road, Vadapalani Madras-600 026
6.	*Name & Address of individuals who own the paper*	Chandamama Publications PARTNERS:

1. Sri B. Nagi Reddi
2. Smt. B. Padmavathi
3. Smt. B. Bharathi
4. Sri B. V. Sanjaya Reddi (Minor)
5. Sri B. N. Suresh Reddi
6. Sri B. V. Satish Reddi

I, B. Viswanatha Reddi, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

B. VISWANATHA REDDI
Signature of the Publisher

1st March 1974

গুপ্তধনের খোঁজে রাম আর শ্যাম
দুই বন্ধুর দায় হল আর যাবে যাকো, কাগজ পেল গুপ্তধনের নকশা আঁকা
বীরের মত অ্যাডভেঞ্চার করার আশায়, অমনি ওরা সমুদ্দুরে নৌকা ভাসায়
এমনিতে বেশ নির্ঝঞ্ঝাট ক'দিন গিয়ে, হঠাৎ মাথে তুফান এলো ঘূর্ণী নিয়ে
অ্যাডভেঞ্চার খুব জমল দারুণ ঝড়ে, ভেসে এসে ওরা একটা চরে পড়ে
বেশ কিছুক্ষণ এধার ওধার ঘুরে ঘুরে, দেখতে পেল ছোট কুটির খানেক দূরে
একটা বুড়ো ঝিমুচ্ছিল নাক ডাকিয়ে, নকশা দেখে বেবাক অবাক রয় তাকিয়ে
খাও বাচ্চারা গুপ্তধনের সেরা পপিন্স, মিষ্টি ফলের বীর বাচ্চার প্রাইজ-পপিন্স
খেতে ভাল · দেখতে ভাল · ভাবতে ভাল
পার্লে
পপিন্স
ফলের স্বাদে ভরা লজেন্স
PARLE POPPINS
৫ রকম ফলের স্বাদে ভরপুর-
রাস্পবেরী, আনারস, লেবু, কমলালেবু ও মৌসম্বী
প্রত্যেক প্যাকেটে ১৩টি লজেন্স
everest/507/PP Ben

চাঁদমামা
সংস্থাপক : বি. নাগি রেড্ডি
নিয়ন্ত্রণ : চক্রপাণি
এমাসের বেতাল কথা পরিবেশিত হয়েছে বনের অধিবাসীদের অন্ধ বিশ্বাসের বিষয়ে।
প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য ওরা ওদের রাজাকে ভুল বুঝে তাকে ত্যাগ করে ছিল। রাজা সব হারাল আবার সব পেল কিন্তু ওরা আঁকড়ে ছিল ওদের অন্ধ বিশ্বাস।
পরিচালনার সুবিধার জন্য দেশ ভাগ হল। তাতে যে কী পরিমান দেশের ঐক্য নষ্ট হল তা জানা যাবে 'সবার উপরে' পড়ে। লোভ যে মানুষকে কোথায় নিয়ে যায় তা যেন 'সাত ঘড়া সোনা' পড়ে ভাল ভাবে বুঝতে পারি।
আরও কত মজার কাহিনী আছে। এ ছাড়া যক্ষ পর্বত, মহাভারত ও মিত্র-ভেদ চলছে।
খণ্ড ২
মার্চ ১৯৭৪
সংখ্যা ৯
CP
CHITRA

অমর বাণী

চিতা চিন্তা দ্বয়োর্মধ্যে
চিন্তা নাম গরীয়সী,
চিতা দহতি নির্জীবম্,
চিন্তা প্রাণ যুতম্‌বপুঃ। ॥১॥

[চিতার চেয়ে চিন্তা বড়। চিতা প্রাণহীন শরীর পোড়ায় কিন্তু চিন্তা প্রাণসহ যে শরীর তা জ্বালায়।]

অজগাম যদা লক্ষ্মীঃ
নারিকেল ফলাম্বুবৎ,
নির্জগাম যদা লক্ষ্মীঃ
গজভুক্ত কপিত্থবৎ। ॥২॥

[সম্পত্তি যখন বাড়ে তখন নারকেলে জল আসার মতই আসে, আবার যখন যায় তখন হাতীর পেটে কতবেল যাওয়ার মতই চলে যায়।]

অসারে খলু সংসারে
সারম্ শ্বশুর মন্দিরম্
হিমালয়ে হরশ্‌শেতে,
হরিঃ শেতে মহোদধৌ। ॥৩॥

[সারহীন সংসারে শ্বশুরবাড়ি খুব ভাল জায়গা। (সেইজন্য) শিব (পার্বতীর জন্মস্থান) হিমালয় পর্বতে, বিষ্ণু (লক্ষ্মীর জন্মস্থান) সমুদ্রে নিবাস করিতেন।]

যক্ষ পর্বত

স্মৃতি

[সমরবাহুর অনুচরেরা একটি বল্লম দিয়ে বীরপুরের সেনানায়ককে ঘায়েল করে ফেলল। কিন্তু বাঘ ও সিংহকে ওদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়ার ফলে ওরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হল। স্বর্ণাচারি পালানোর চেষ্টা করল কিন্তু সামনেই পড়ে গেল বীরপুরের সেনারা। তারপর⋯]

র্ণাচারি তরবারি উঁচিয়ে বীরপুরের ঘাড়সওয়ার সেনাদের উপর উট নিয়ে াঁপিয়ে পড়ল।

এতে সমরবাহুর অনুচররাও খুব ৎসাহ পেয়ে বীরপুরের সেনাদের উপর াঁপিয়ে পড়তে এগিয়ে গেল।

ফলে উভয় দলে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। টের উপর সওয়ার হয়ে বল্লম ও তর- ারি দিয়ে ঘোড়ায় চড়া বীরপুরের সেনাদের পর্যুদস্ত করতে থাকল। তবে যুদ্ধে কেউ হেরে যায়নি অত সহজে। ছলেবলে সমস্ত রকমে মোকাবিলা করেছে ওরা।

পাঁচ সাত মিনিটের প্রচণ্ড যুদ্ধে উভয় পক্ষের কয়েকজন সৈনিক আহত হয়ে বাহনের উপর থেকে নিচে পড়ে গেল। বীরপুরের ঘোড়াগুলো কোন দিন এর আগে উট দেখেনি।
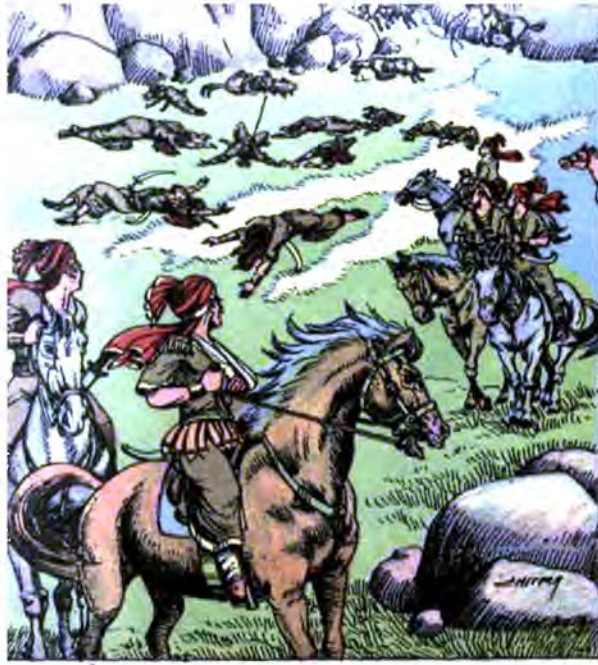
ফলে কিছুক্ষণের জন্য ঘোড়াগুলো থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগল। পালাতে লাগল কয়েকটা ঘোড়া। ফলে যারা এসেছিল সমরবাহুর অনুচরদের ঘিরে ফেলে পরাজিত করতে তারা পারল না জয়ী হতে। পালানোর চেষ্টা করেও পালাতে পারল না স্বর্ণাচারি। শেষে অবস্থা ফিরে গেল। স্বর্ণাচারিকেও কৌশল বদলাতে হল। কারণ তার পক্ষের লোকও অনেকে আহত হয়েছে।

মাত্র পনর ষোলজনকে নিয়ে আর কতক্ষণ যুদ্ধ করা যায়। ওদের নিয়ে স্বর্ণাচারি পালাল।

এই পালানোর পিছনে একটি কারণ আছে। স্বর্ণাচারির মনের গভীরে একটি উদ্দেশ্য আছে। ঐ উদ্দেশ্যকে কার্যকরী তাকে করতেই হবে। এবং তা করতে হলে তাকে আর বিপদের ঝুঁকি এই ক্ষেত্রে নেওয়া উচিত নয়।

ততক্ষণে বীরপুরের সেনাপতি ওখানে এসে বলল, "একি তোমাদের ভিতর থেকে শত্রুরা পালাতে পারল কি করে? তোমরা কি করছিলে?"

বীরপুরের ঘোড় সওয়ার নেতা এসে বলল, "আমরা বহু শত্রু সেনাকে বধ করতে পেরেছি। অন্যেরা বনে পালিয়েছে।"

"যারা পালাচ্ছে তাদের বন্দী না করে তুমি এখানে কি করছ?" সেনাপতি রেগে গিয়ে বলল।

"আজ্ঞে আমি ভেবেছি আমার আহত সেনাদের বাঁচানোর ব্যবস্থা করে আরো ঘোড় সওয়ার সেনা নিয়ে জঙ্গলে ওদের আক্রমণ করে শেষ করে দেব।" ঘোড় সওয়ার সেনাদের নেতা বলল।

"তুমি ভাবছ, তুমি যতক্ষণ না তৈরি হয়ে ওদের আক্রমণ করতে যাচ্ছ তত-ক্ষণ ওরা তোমার অপেক্ষায় বসে থাকবে? তোমরা হেরে গেছ, অথবা তোমাদের ভেতর থেকে ওরা পালিয়েছে, এ দুটোর মধ্যে একটাও সত্য হলে তোমরা

কি বুঝতে পারছ না যে রাজা তোমাদের কি শাস্তি দেবেন ? ভেবে দেখেছ ? তোমার আর আমার ফাঁসি হবে।"

সেনাপতি চটে গিয়ে বলল।

"আজ্ঞে ওদের আপনি ছোট শত্রু ভাববেন না। আমি নিজের কানে শুনেছি অনুচররা ওদের একজনকে মহা-মন্ত্রী বলে ডাকছে। ওরা যেভাবে চলে ও কথা বলে তাতে মনে হয়-ওরা এক মহাভারত···।"

ঘোড় সওয়ারদের নেতার কথা শেষ হতে না হতেই সেনাপতি গর্জে উঠে বলল, "তুমি তোমার ভাষণ বন্ধ করবে ? আর কালমাত্র বিলম্ব না করে যে কজন ঘোড় সওয়ারকে পাও, ওদের নিয়ে অনুসরণ কর। আমি আগে এই পাহাড়ের উপর উঠে পতাকা তুলে তোমাকে সাহায্য করতে যাচ্ছি। তখন আমি আরও কিছু সেনা নিয়ে যাব।"

ঘোড় সওয়ারদের নেতা সেনাপতিকে নমস্কার করে তার নির্দেশ মত স্বর্ণা-চারিকে অনুসরণ করতে গেল।

সেনাপতির কথা শুনে ঘোড় সওয়ার নেতা বুঝতে পারল যে স্বর্ণাচারিকে ধরতে না পারলে তাকে মৃত্যু বরণ করতে হবে।

কিন্তু ততক্ষণে স্বর্ণাচারি সদলবলে অনেক দূর চলে গিয়েছিল। তার উদ্দেশ্য কোন রকমে খড়্গবর্মা, জীবদত্ত ও সমর বাহুকে পাহাড়ী দুর্গের হাতছাড়া হওয়ার খবর দেওয়া।
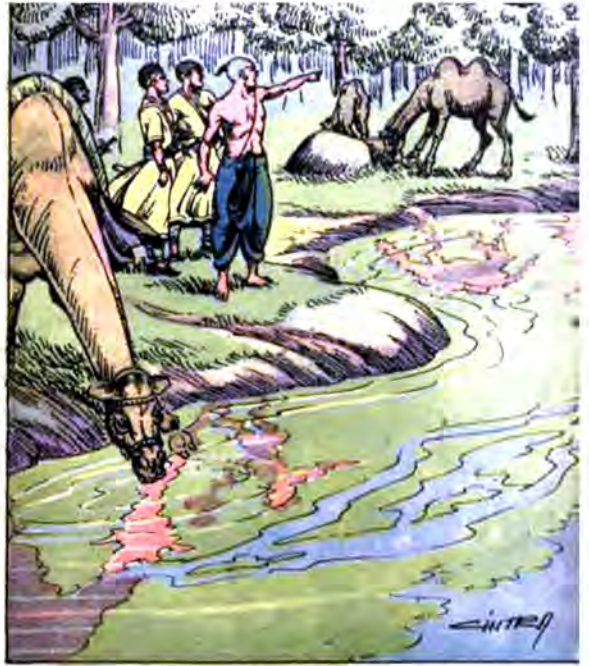
সে জানত কোন পথে গেলে সে ভালুক জাতের লোকের আস্তানা খুঁজে বের করতে পারবে। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর সদলবলে স্বর্ণচারি একটি পুকুরের কাছে পৌঁছাল।

ওরা উট থেকে নাবল। ওদের জল খাইয়ে চরতে ছেড়ে দিল। তারপর স্বর্ণাচারি তার দুজন অনুচরকে বলল, "শোন, বীরপুর থেকে পদাতিক অথবা ঘোড় সওয়ার সেনা আমাদের খোঁজে

আসতে পারে। ওরা যদি কম সংখ্যক সেনা থাকে তাহলে আমরা ওদের মেরে ফেলে মাটিতে পুঁতে ফেলব। আর যদি বেশি সংখ্যায় আসে তাহলে এই জায়গা ছেড়ে আমাদের তৎক্ষণাৎ পালাতে হবে। তাই এখন তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে চারদিকে নজর রাখা।"

আধ ঘন্টা পেরিয়ে গেল। গাছের উপর বসে সমরবাহুর একজন অনুচর দেখতে পেল দশবার জন ভালুক দলের লোক দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হয়ে ঐ পুকুরের দিকে ছুটে আসছে। এই দৃশ্য দেখে লোকটা স্বর্ণাচারির কাছে গিয়ে সব কথা বলল।

স্বর্ণাচারি অনুচরদের নিয়ে অদূরে গাছের আড়ালে লুকিয়ে বলল, "যাদের খোঁজে আমরা যাচ্ছিলাম তারাই এদিকে আসছে। এই ভালুক দলের লোকেরাই আমাদের রাজা সমরবাহুকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল।"

ইতিমধ্যে ভালুক দলের লোক পকুরের কাছে পৌঁছে গেল। ওদের একজন দেখতে পেল কয়েকটা উট ঘাস চরে বেড়াচ্ছে। দেখেই তার গোটা শরীর ভয়ে কাঁপতে লাগল।

সে বলল, "হে, মা বৃকেশ্বরী, আমাদের বাঁচাও।" সে তাড়াতাড়ি অন্যদের দেখাল ঐ উটগুলোকে।

ভালুক দলের লোক মুহূর্তের জন্য কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওদের সেই অবস্থা দেখে স্বর্ণাচারি মুহূর্তে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুজনের গায়ে বল্লম চালিয়ে দিল। ওরা "হে মা, বৃকেশ্বরী" বলে আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। পরক্ষণেই পাঁচ সাতজন ভালুক দলের লোক তাদের কাছে অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পন করল। আর বাকি যারা ছিল তারা বাঘকে দেখে হরিণের মত পালাল।

নতুন পরিস্থিতিতে নতুন কৌশল অবলম্বন করাই শত্রুকে পরাস্ত করার

শ্রেষ্ঠ পন্থা। স্বর্ণাচারি মহামন্ত্রী হতে চায়। তাই সে নিজের বুদ্ধি সব সময় এ ব্যাপারে সজাগ রাখে।

ভালুক দলের যারা পালাল তারাই পুকুরের কাছে যা ঘটেছে তা পুকুরের দিকে যারা আসছিল সেই খড়্গবর্মা, জীবদত্ত, সমরবাহু ও গুরু ভালুককে বলল।

"সে কি! যে স্বর্ণাচারির দুর্গের কাজে জড়িত থাকার কথা সে এখানে এসেছে কেন? এতো বড় তাজ্জব ব্যাপার! পাহাড়ে কোন বিপদ ঘটেনি তো! পালিয়ে আসেনি তো!" জীবদত্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বলল।

"স্বর্ণাচারির রাজভক্তি সন্দেহাতীত। হয়ত ভালুক জাতের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করতে এখানে এসেছে।" সমরবাহু খুশী মেজাজে বলল।

জীবদত্ত কেন যে একথা বলল তা সে বুঝতেই পারল না।

এইসব কথা গুরু ভালুক ঠিক বুঝতে না পেরে সে ভাবল নতুন কোন দলের আক্রমণ সমাগত।

সে জোড় হাত করে খড়্গবর্মা ও জীবদত্তকে বলল, "মশাই, আপনারা আমাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন, সে কথা ভুলে যাবেন না।"

গুরু ভালুকের কথা শুনে জীবদত্ত হেসে উঠে বলল, "গুরু ভালুক, আমাদের আর এই পুকুরের ঘাটে যারা আছে তাদের পক্ষ থেকে তোমার কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। আমরা যা বলি তাই করি। আমাদের অবিশ্বাস করো না। আমরা যা করি বলে করি। রীতিমত ঘোষণা করে করি। ভয় পেয়ো না।"

"সাক্ষাৎ বৃকেশ্বরী দেবীর কৃপাতো তোমার উপর আছে, তুমি ভয় পাচ্ছ কেন?" খড়্গবর্মা উপহাস করে বলল।

ওরা সব এই ধরণের কথা বলতে বলতে পুকুর ঘাটে পৌঁছাল। ততক্ষণে সমরবাহু কোথায় আছে কেমন আছে ইত্যাদি প্রশ্ন করছিল স্বর্ণাচারি বন্দী

ভালুকজাতের লোককে। সে খড়্গবর্মা, জীবদত্ত ও সমরবাহুকে দূর থেকে আসতে দেখতে পেল। তাড়াতাড়ি তাদের কাছে ছুঁটে এসে নমস্কার করে বলল স্বর্ণাচারি, "মহারাজা সমরবাহু, ক্ষত্রিয় যুবকগণ, আপনারা আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।"

জীবদত্ত স্বর্ণাচারির কাঁধে হাত চাপড়াতে চাপড়াতে বলল, "স্বর্ণাচারি, মনে হচ্ছে তুমি তোমার মহারাজার দুর্গ থেকে বনে বিহার করতে বেরিয়েছ ?"

"ক্ষত্রিয় বীরগণ, সেই দুর্গ এখন শত্রুর কবলে পড়ে গেছে। দুর্গকে রক্ষা করতে আমি ও সমরবাহুর অনুচররা আপ্রাণ চেষ্টা করেও পারিনি। এই চেষ্টা করতে গিয়ে আমাদের কয়েকজন অনুচর স্বর্গে গেছেন।" স্বর্ণাচারি গুরু গম্ভীর বিষাদপূর্ণ গলায় বলল।

"কিছু লোক বেঁচে থাকলেও চলবে। তোমার রাজার নাম রক্ষার জন্য কয়েক-জন হলেই চলবে, কি চলবে না ?" হাসতে হাসতে খড়্গবর্মা বলল।

স্বর্ণাচারি নিজের সঙ্গে যাদের এনেছিল তাদের দেখিয়ে সমরবাহুকে বলল, "আমাকে নিয়ে এখন মোট ষোলজন আমরা আছি।"

"আমাদের পাহাড়ী দুর্গ শত্রু দখল করে নিয়েছে ? কি ভাবে দখল করতে পারল ওরা ? কারা ওরা ?" সমরবাহু দাঁতে দাঁত ঘষে বড় বড় চোখে গর্জে উঠে জিজ্ঞেস করল।

স্বর্ণাচারী কিভাবে চিড়িয়াখানার অধিকারী বনে এসেছিল, কি ভাবে তারা সজ্জিত হয়ে এল এবং কিভাবে তারা তাদের বূহ্য ভেদ করে বনে পালিয়ে-এল ইত্যাদি সবিস্তারে জানাল।

সমস্ত কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে সমরবাহু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, "তার মানে, বহুদিন ধরে আমরা যে খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করে ছিলাম তা শত্রুর হাতে পড়ে গেল ? বীরপুরের রাজাকে কোন

ক্রমেই ক্ষমা করা চলে না। ঐ রাজাকে শেষ করে ফেলতে হবে। হে ক্ষত্রিয় বীরগণ, এই মুহূর্তে আপনাদের সাহায্য আমি প্রার্থনা করি।"

জীবদত্ত সমরবাহুর দিকে তাকিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে কি যেন বলতে যাচ্ছিল এমন সময় খড়্গবর্মা গর্জে উঠে বলল, "সমরবাহু এখন তুমি কি ধরণের বিপদের মোকাবিলা করতে চাও? কি ধরণের কাজ তুমি আমাদের কাছ থেকে আশা কর? আমরা ভালুক দলের হাত থেকে তোমাকে উদ্ধারের কথা দিয়েছিলাম, উদ্ধার করেছি। এখন আমরা নিজেদের পথে যেতে চাই। আমরা বিন্ধ্য পর্বতে যাচ্ছি। বিপদের হাত থেকে অন্যদের রক্ষা ও উদ্ধার করতে গিয়ে আমাদের অনেক সময় ব্যয় হয়ে গেছে। আর অপেক্ষা করা যায় না।"

জীবদত্ত খড়্গবর্মার পিঠে হাত চাপড়াতে চাপড়াতে তাড়াহুড়ো না করার ইশারা করে বলল, "সমরবাহু তুমি রাজ্য উদ্ধারের জন্য এত আগ্রহ পোষণ করছ কেন? তুমিতো দেখলে একটি রাজ্য গড়া এবং তার দখল রাখা অত সহজ নয়। তার চেয়ে এই বিরাট অরণ্যের যে কোন অঞ্চলে চাষ আবাদ করে তুমিতো সদলবলে এখন আরামেই
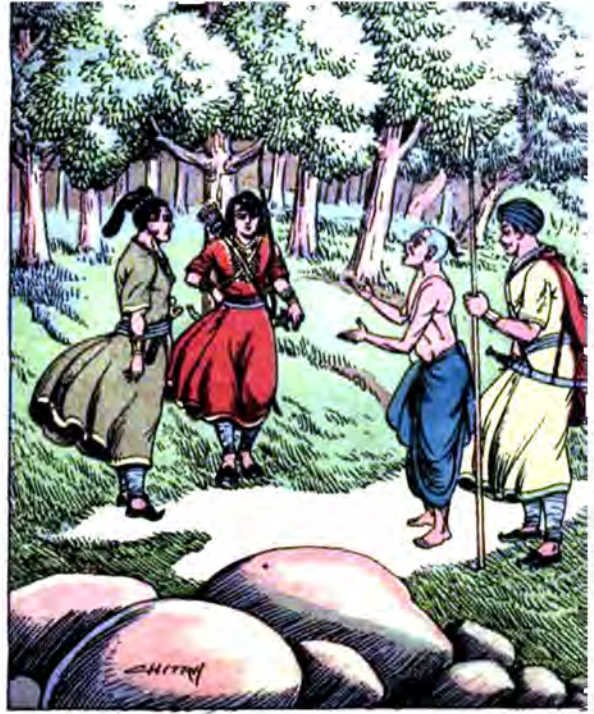
থাকতে পার।"

এই কথার পিঠে সমরবাহু কোন জবাব দিতে পারল না।

মাথা নিচু করে কি যেন ভাবতে লাগল। তখন স্বর্ণাচারি নাক গলিয়ে বলল, "হে ক্ষত্রিয় যুবকগণ, আমার কথা মন দিয়ে শুনুন। সমরবাহুর নাম শুনে আমার মনে হচ্ছে ইনি কোন চন্দ্রবংশের লোক। আমার ভীষণ ইচ্ছা এঁর করায়ত্বে সুন্দর একটি ছোটখাট রাজ্য থাক আর আমি সেই রাজ্যের মন্ত্রী হই। আপনাদের সাহায্য পেলে আমার ধারণা আমরা সহজেই বীরপুরের রাজার কবল থেকে ঐ দুর্গ উদ্ধার করতে

পারব। তখন ঐ দুর্গের আশপাশের কিছু অঞ্চল জুড়ে একটি ছোট্ট রাজ্য গড়ে তুলে আমরা থাকতে পারব।"

তখন জীবদত্ত খড়্গবর্মার দিকে তাকিয়ে বলল, "খড়্গবর্মা, ভাবছি সাহায্য করাই ভাল।" তারপর সমরবাহুও স্বর্ণাচারির দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের প্রথম কর্তব্য হবে, এখানে যে বীরপুরের সেনারা আসবে তাদের মোকাবিলা করা। আমরা সংখ্যায় বেশি নেই। তাই মুখোমুখি আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়তে যাব না। আমরা অন্য কৌশল নেব। ঐ সেনাদের আমরা গুরু ভালুকের দুর্গে ঢোকাব।"

"সেটা কি করে সম্ভব? ওরা বোকার মত ঢুকতে চাইবে কেন ঐ দুর্গে?" স্বর্ণাচারি প্রশ্ন করল।

তখন জীবদত্ত বুঝিয়ে বলল, "বলছি শোন। এই গুরু ভালুকের দুএকজন লোক আগে বীরপুরের সেনাদের নেতাকে বলবে যে আমরা ঐ দুর্গে ঢুকে আত্মরক্ষা করেছি। তখন ওরা আমাদের বধ করার উদ্দেশ্যে ঐ দুর্গে ঢুকবে। তারপরে আমরা তাদের অল্প লোক দিয়ে সহজ কৌশলে খতম করতে পারব।"

তারপর জীবদত্ত গুরু ভালুককে বলল, "আচ্ছা ভালুক, তোমার শিষ্যরা কি তোমার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে? না কি বিশ্বাসঘাতকতা করে?"

এই প্রশ্ন শুনে গুরু ভালুক বলল, "হুজুর, আমার শিষ্যদের গুরু ভক্তি আমি এক্ষুণি প্রমান করে দিচ্ছি। আমার নির্দেশে ওরা পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিতে পারে। দেখুন আপনাদের সামনেই দেখিয়ে দিচ্ছি।" বলে পাশের এক অনুচরকে সে বলল, "ওরে এই, গাছের উঁচু ডালে উঠে মাথা নিচের দিকে রেখে ঝাঁপ দাওতো।"

জীবদত্ত বাধা দেবার আগেই লোকটা একটা উঁচু গাছে উঠে "গুরু ভালুক!" বলে চিৎকার করে মাথা নিচের দিকে রেখে পড়ে গেল। (আরও আছে)

দেবতার রাগ

নাছোড়বান্দা বিক্রমাদিত্য আবার সেই গাছের কাছে গেলেন। গাছ থেকে শব নাবিয়ে যথারীতি মৌন ভাবে শব কাঁধে ফেলে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, "রাজা, দেবতাদের নিন্দা করার ফলে অনেক সময় নানা রকমের বিপদ ঘটে যায়। তোমার কাজ দেখে সন্দেহ জাগছে, তুমিও দেবতাদের বিরুদ্ধে কিছু করছো কিনা। দেবতাদের বিরুদ্ধে যৌধেয় শৃঙ্গ গিয়েছিল। ফলে তাকে অনেক দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে। আমি এখন তোমাকে তার কাহিনী শোনাচ্ছি। শুনলে তোমার ভালই লাগবে। এত রাত্রে তুমি যে পরিশ্রম করছ তা কিছুটা লাঘব হতে পারে।"

বেতাল কাহিনী শুরু করল: প্রাচীন কালে সিন্ধু প্রদেশের বহপ্রান্তে নানা জাতের বনবাসীরা বাস করতো। তারা

বেতাল কথা

বনেই থাকত। বনের জীবজন্তু শিকার করাই তাদের একমাত্র কাজ ছিল। ওদের মধ্যে একজনের নাম ছিল শৃঙ্গ। তার শক্তি সাহস ও শিকার করার কৌশলের ফলে সে কিছুদিনের মধ্যেই একটি দুর্গ তৈরি করে নিতে পারল। কৈশোর অবস্থা থেকেই সে শিকারের ব্যাপারে অন্যদের নেতৃত্ব দিত। এভাবে যৌধেয় জাতির লোক তাকে একদিন তাদের নেতা হিসাবে ঘোষণা করল। নেতা হয়ে শৃঙ্গের ইচ্ছে করল গোটা জাতির উন্নতি সাধনের। সে তার সমগ্র যৌধেয় জাতির উন্নতির জন্য সমস্ত রকমের কষ্ট স্বীকার করে রাতদিন পরিশ্রম করতে লাগল।

যৌধেয়দের বাসস্থানের পাশে মায়াব নামক আর এক জাতের লোক বাস করত। ওরা যাদুর সাহায্যে নানা দিক থেকে নানা ভাবে অনেক ধন সম্পত্তি জমিয়ে ছিল। ওরা যাদু বলে এমন কি ঘর বাড়িও বানাতে পারত। তবু, ওদের একটা অভাব ছিল। তা হল ওদের শক্তি। ওরা নিজেদের মত করে দুর্গ বানিয়ে তাতে নিশ্চিন্তে বাস করতে লাগল। বাইরের কোন শত্রুকে আক্রমণ করার মত শক্তি তাদের ছিল না। আক্রমণ করার শক্তি না থাকলেও আত্মরক্ষা করার শক্তি না থাকলে কোন দুর্গই বেশিদিন রক্ষা করা যায় না।

আক্রমণ না করলে নিজেদের কবলিত অঞ্চল বাড়ানো যায় না। তাই আক্রমণ করার মত বাহিনী গঠনের দিকে প্রথম নজর দিতে হল শৃঙ্গকে।

শৃঙ্গ নিজের জাতের লোককে ভাল-ভাবে যুদ্ধ কৌশল শিখিয়ে মায়াব লোকের দুর্গের উপর আক্রমণ করল। মায়াবরা যাদুর সাহায্যে শৃঙ্গকে রোখার চেষ্টা করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হল। শৃঙ্গ ওদের দুর্গ দখল করে নিল। মায়াব জাতির বিভিন্ন শিল্পীদের দিয়ে মনের মত দুর্গ ও একটি নগর তৈরি করে নিল

শৃঙ্গ। ঐ লুণ্ঠিত জিনিস দিয়ে সেই নগর সাজাল।

যারা বনে বাস করত, সেই যৌধেয় জাতের মানুষ নগরে বাস করার সুযোগ পেল শৃঙ্গের জন্য। নগরে বাস করতে করতে ওরা নানা ধরনের পেশা শিখে নিল। চাষ-আবাদ থেকে ব্যবসা বানিজ্য পর্যন্ত সব কিছু যৌধেয় লোকের শেখা হয়ে গেল।

শৃঙ্গকে ওরা রাজা করে নিল।

কিন্তু শৃঙ্গ লক্ষ্য করল তার জাতের লোক অনেক দূর এগিয়ে গেলেও তারা অনেকগুলো কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস নিয়েই আছে। কুসংস্কারের হাত থেকে তাদের মুক্ত করার জন্য শৃঙ্গ ভাবতে লাগল। শেষে একটি পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য যৌধেয় জাতের প্রত্যেককে একদিন মাঠে জমায়েত হতে বলল। যৌধেয় জাতের লোক শৃঙ্গকে দেবতার মত ভক্তি করত। তাই তার আদেশ পাওয়া মাত্র ওরা বিরাট এক মাঠে হাজির হল। সেই মাঠের সামনে ছিল রাজমহল, পিছনে ছিল পাহাড়।

শৃঙ্গ তার রাজমহলের উপরে উঠে তার প্রজাদের দেখল। তাকে দেখতে পেয়ে প্রজারা তার জয়ধ্বনি করল। শৃঙ্গ তাদের উদ্দেশ্যে বলল, "আমি

তোমাদের প্রথমেই একটি প্রশ্ন করতে চাই। তোমরা যখন বনে থাকতে যে রকম ছিলে, যতটা কষ্ট সহ্য করেছিলে তার চেয়ে এখন অনেক ভাল আছ কি না? তোমাদের কষ্ট অনেক কমে গেছে। কি না? এখন তোমরা বল এর কারণ কি? এর আগে যদি না ভেবে থাক তবে এখন ভেবে বল।"

"সবই ভগবানের দয়া।" প্রজারা একবাক্যে বলল।

ওদের কথা শুনে শৃঙ্গের বিরক্তি জাগল। সে প্রজাদের বলল, "এতে ভগবানের দয়ার কি আছে? তোমরা পরিশ্রম করে যুদ্ধ কৌশল শিখলে, দুর্গ
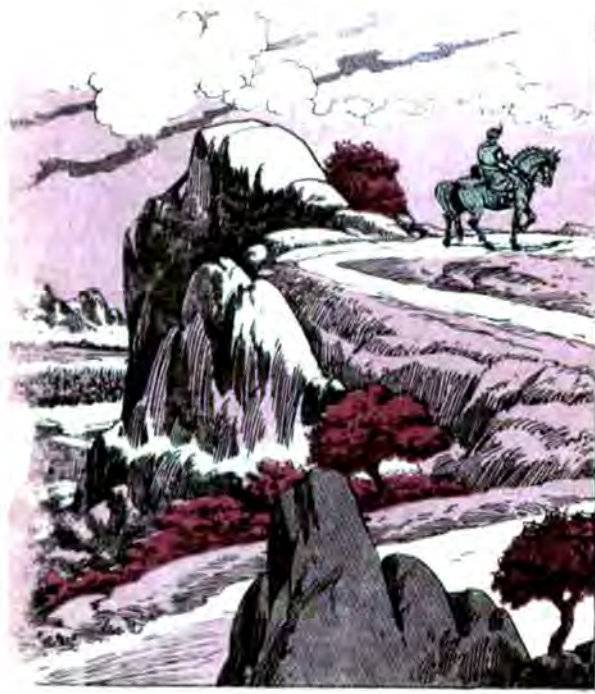
দখল করলে, নগর গড়ে তুললে, চাষ-আবাদ করছো, ব্যবসা বাণিজ্য করছো আর বলছ কিনা ভগবানের দয়া !"

পরক্ষণেই সমস্ত আকাশ কাল মেঘে ঢেকে গেল। ভয়ঙ্কর ঝড় উঠল। ভূমি-কম্প হল। রাজমহলের পাহাড়ের চূড়া থেকে লাভা বেরুল। জমির ভিতর থেকে হাজার হাজার সাপ বেরুলো। চাষ-আবাদ সব আশা মাটিতে মিশে গেল। ফলে বহু প্রজা মারা গেল। এমন কি শৃঙ্গের পোষাকের রঙও বদলে গেল।

প্রজারা খুব ভয় পেয়ে যে যেদিকে পারল পালাল। তারা মাথা গোঁজার ঠাঁই পেল না। কারণ ভূমিকম্পের ফলে ঘর বাড়ি সব ভেঙ্গে পড়েছিল।

যৌধেয় জাতির যে গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা শৃঙ্গের উপর ছিল তা চোখের পলকে উবে গেল। ওদের দৃঢ়বদ্ধ ধারণা হল শৃঙ্গ ভগবানকে নিন্দে করেছে বলেই এসব হয়েছে।

প্রজাদের এই মনোভাবের কথা উত্তরাঞ্চলের রাজা রাবল জানতে পেরে সেনাবাহিনী নিয়ে শৃঙ্গের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করল।

শৃঙ্গ প্রজাদের উত্তেজিত করে রাবল রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করানোর অনেক রকমের চেষ্টা করল।

কিন্তু প্রজাদের মন ভেঙ্গে গিয়েছিল, শৃঙ্গের উপর আস্থা ছিল না। ফলে তারা যুদ্ধ করতে এগোল না। তখন নিরুপায় হয়ে শৃঙ্গ রাবল রাজার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য গোপন পথে পালিয়ে গেল। মায়াব, যবন ও অন্য বনবাসীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সে বাধ্য হয়েছিল পূব দিগের পথ ধরে পালাতে।

অনেক কষ্টে সে রেগিস্তান পার হয়েছিল। কুড়ি দিন কষ্ট করে ইন্দ্রপ্রস্থ নামক রাজ্যে শৃঙ্গ পৌঁছাল।

শৃঙ্গ ইন্দ্রপ্রস্থের একটি উদ্যানের দিকে তাকিয়ে দেখল। সেই সময় রাজকুমারী কেশিনী উদ্যানে বেড়াচ্ছিল। শৃঙ্গ

উদ্যানের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে বাধা পেল। পাহারায় যে ছিল সে তাকে বাধা দিল।

তখন উদ্যানের বাইরে একটি গাছের নিচে সে শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে রাজকুমারীর পরিচারিকা উদ্যানের বাইরে এসে শৃঙ্গের চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়ে ছুঁটে গিয়ে রাজকুমারীকে জানাল। রাজকুমারী কেশিনী ঐ যুবককে ডেকে পাঠিয়ে তার ক্লান্ত দেহ দেখে তাকে কিছু ফল খেতে দিল। ঐটুকু সময়ের মধ্যে কেশিনী বুঝতে পারল যে ঐ যুবক সাধারণ যুবক নয়। তাই তাকে সহানুভূতির সঙ্গে প্রশ্ন করল, "আপনি কে? কোথেকে আসছেন? কোথায় যাবেন?"

কেশিনী ছিল অপূর্ব সুন্দরী। প্রথম দর্শনেই শৃঙ্গ তার রূপে মুগ্ধ হল। শৃঙ্গ থেমে থেমে গম্ভীর গলায় বলল, "এখন আমার আর কোন পরিচয় নেই। তবে এক সময় পরিচয় ছিল।"

কেশিনী ঐ যুবককে রাজমহলে নিয়ে গিয়ে রাজার কাছে তার ইচ্ছা প্রকাশ করল।

মেয়ের কথা শুনে অবাক হয়ে কেশিনীর বাবা বলল, "যার কোন ঠিকানা নেই, নাম নেই, তাকে কোন্ ভরসায় কোন্ বিশ্বাসে বিয়ে করতে চাও মা? তোমাকে বিয়ে করার জন্য কত বড় বড় রাজার কুমাররা অপেক্ষা করছে।"

কেশিনী তখন শৃঙ্গের দিকে ঘুরে তাকে বলল, "আপনাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে আপনি রাজকুমার। আপনি আপনার সত্য পরিচয় দিলে আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে। বাবার মত পাব।"

শৃঙ্গ ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "আমি এখন অসহায়। আমার ভাগ্য এখন বিড়ম্বিত। এই অবস্থায় আমি আমার পরিচয় কি করে দিতে পারি!" বলে শৃঙ্গ নিজের সমস্ত কাহিনী বলল।

কেশিনী যখন জানতে পারল যে ঐ যুবকই যৌধের শৃঙ্গ তখন তার খুব আনন্দ হল। কারণ এই ঘটনার কয়েকদিন আগেই সে শৃঙ্গের নাম শুনেছিল। তার বীরত্বের কাহিনীও শুনেছিল। তাই কেশিনী শৃঙ্গকে বলল, "আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। আমাকে বিয়ে করার পর আপনি এই ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য পাবেন। যে রাজ্য হারিয়েছেন. তার জন্য দুঃখ করার আর কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনার দুর্ভাগ্যের দিনও শেষ হয়ে গেছে ধরে নেবেন।" তারপর কেশিনী বাবার অনুমতি চাইল।

সব কথা শুনে রাজা ঠিক করতে পারল না কি করবে। তখন রাজা মন্ত্রীদের নিয়ে মন্ত্রণা কক্ষে গেল। রাজ-কুমারী কেশিনী ওদের মন্ত্রণা কক্ষে যেতে দেখে তাড়াতাড়ি সে নিজেও ঐ কক্ষে ঢুকে পর্দার আড়ালে দাঁড়াল। ওদের সমস্ত কথাবার্তা শুনল।

শুরুতে রাজা শৃঙ্গের সমস্ত কাহিনী শুনিয়ে মন্ত্রীদের বলল, "শঙ্খ এখন আমাদের অতিথি সে কথা আমরা যেন ভুলে না যাই।"

তৎক্ষণাৎ একজন মন্ত্রী বলল, "মহারাজ, রাবল এক শক্তিশালী রাজা। এই সুযোগে আমরা যদি শৃঙ্গকে বন্দী করি, রাবল রাজার হাতে তাকে তুলে দি তাহলে রাবল রাজার সঙ্গে আমাদের মৈত্রী অনন্তকাল ধরে অটুট থাকবে।"

"অতিথিকে শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। নীতি বিরুদ্ধ কাজ। রাবল রাজা যদি ইতিমধ্যে টের পেয়ে থাকে যে, শৃঙ্গ আমাদের অতিথি হয়ে আছে তাহলে ঐ রাজা আমাদের উপর আক্রমণ করবে।" অন্য এক মন্ত্রী বলল।

এই সব কথা শুনে আর এক মন্ত্রী বলল, "মহারাজ, রাজকুমারীর ইচ্ছা-পূরণের মাত্র একটি উপায় আছে। এই

সুযোগে আমরাও তো প্রতিবেশী রাজাদের সাহায্য নিয়ে রাবল রাজাকে আক্রমণ করতে পারি। ওর উপর বহু রাজা চটে আছে। রাবল প্রত্যেক রাজার সঙ্গে পায়ে পা বাঁধিয়ে ঝগড়া করে। এর ফলে শৃঙ্গও নিজের বদলা নিতে পারবে। আর রাজকুমারীর ইচ্ছাও পূরণ হবে।"

এই প্রস্তাব উপস্থিত সকলের কাছে ভাল লাগে। বহু ছোট ছোট দেশের রাজা রাবলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রাজী হল। রাবলের বিরুদ্ধে বিরাট এক সেনাবাহিনী গঠিত হল। শৃঙ্গ ঐ বাহিনীতে একজন সাধারন সৈনিক হিসাবে যোগদান করল। যুদ্ধক্ষেত্রে রাবলের বিরুদ্ধে স্বয়ং শৃঙ্গ এগিয়ে এল। রাবলকে শৃঙ্গ বধ করল।

তারপর শৃঙ্গ নিজেব জাতির লোককে খোঁজ করে জানতে পারল যে ওদের অনেকে বনে ফিরে গেছে। আর বাকি লোকগুলো যবন মায়াবদের গোলাম হয়ে গেছে।

শৃঙ্গ নিজের জাতের সবাইকে আবার জড় করে নিজের হারানো রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে কেশিনীকে বিয়ে করে।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, "রাজা, দেবতারা যখন শৃঙ্গের উপর চটে গেল, তখন আবার তাঁরা রাজ্য পাইয়ে দিলেন কেন? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও না দিলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

বিক্রমাদিত্য বললেন, "শৃঙ্গ যে দেবতাদের বিশ্বাস করেনা এই ভুল ধারণা ছিল তার জাতির লোকের। অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ছিল বলেই শৃঙ্গকে ওরা ভুল বুঝেছিল। স্বাভাবিক কারণে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হল, তার জন্য ওরা শৃঙ্গই অপরাধী ভেবেছিল। আবার যখন শৃঙ্গ রাজ্য ফিরে পেল, তখন ওরা ভাবল যে ভগবান আর তার উপরে চটে নেই।"

এইভাবে রাজা বিক্রমাদিত্য মৌন ভাব ভঙ্গ করার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল গাছে। (কল্পিত)

স্ত্রীর পরামর্শ

গ্রামের নাম রূপনগর। এক ছিল পুরোহিত সেই গ্রামে। গ্রামের সব পূজো সে নিজেই করতে চাইত।

দক্ষিণাও নিত বেশি। যারা গরিব তাদেরও দক্ষিণার জন্য পীড়াপীড়ি করত। ফলে গ্রামের মানুষ তার উপর বিরক্ত হয়ে পড়েছিল।

একবার ঐ গ্রামে মহামারির ফলে বহু লোক মারা যায়।

গ্রামের মানুষের সর্বনাশ আর পুরোহিতের পৌষ মাস। মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রত্যেক বাড়িতে পুরোহিতের ডাক পড়ল। পুরোহিত এই সুযোগে প্রত্যেক বাড়িকে গোদান করার জন্য বাধ্য করল। গোদান না করলে নাকি ঐ ভয়াবহ রোগের হাত থেকে মুক্তি পাবে না।

এইভাবে মানুষের অসহায় অবস্থার সুযোগে পুরুত নিজের সম্পত্তি বাড়াতে লাগল।

লোকে পুরোহিতের কথা শুনে ভয় পেয়ে যে যে ধরনের গরু পারল দান করল। ফলে যে গরু চলতে পারে না, নড়তে পারে না তাদেরও কোন রকমে বাড়িতে আনত সেই পুরোহিত।

কিছুদিনের মধ্যে পুরোহিতের গোয়াল গরুতে ভরে গেল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অন্য দিক থেকে। এতগুলো গরুকে সে একা চরাবে কি করে। শুধু কি চরানো, বর্ষাকালে অতগুলো গরুকে ঠিক জায়গায় ছাউনির মধ্যে রাখার সমস্যাও দেখা দিল।

গরুদের রাখার, চরানোর ও ভাল ছাউনির ব্যবস্থা করতে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল।

চরানোর জন্য লোক রাখলে অনেক

জয়শ্রী দে

রচ পড়ে যাবে। তাই সে অনেক ভেবে নিজেই গরুদের নিয়ে বেরুলো। নিজেই তাদের চরিয়ে আনবে ঠিক করল। ফলে স তার নিজের কাজ, পুরুত গিরি করার সময় পেত না। রাতদিন গরুদের খাওয়ানো আর তাদের রাখার ব্যবস্থাতেই সময় কেটে যেত।

কিছুদিনের মধ্যে তার মনে হল যে স দুকূল হারাচ্ছে। সারা জীবন চরালেও দুধ না দেবার মত গরুও কম ছিল না। অনেকগুলো হাড্ডিসার গরু স দান হিসেবে পেয়েছিল। আবার গরু-গুলোকে না চরালেও না খেতে পেয়ে মরে যাবে। সে পাপ আরও মারাত্মক। গো-হত্যার ভাগী হতে হবে তাকে। গরু সামলাতে গিয়ে তার পুরুতগিরি প্রায় শে হয়ে গেল। শেষে একবার ঠিক কর গরু চরানোর জন্য লোক রাখবে। কি যাকেই বলে সেই যা হাঁকে তাতে ঐ দু না দেওয়া গরুদের দিয়ে তার কে লাভ হবেনা।

আর একটা অসুবিধাও ছিল। তা হ পুরুতের বউ আজন্ম রুগী। তার পা অন্য একজনের জন্য রান্না করা সম্ভ হবে না বলে সে জানিয়ে দিয়েছিল শেষে একটা লোক রাখল। নিজে রা করে ঐ লোকটাকে খাওয়াল।

যতই খরচ করুক, যতই লো লাগাক যে গরু দুধ দেয় না, বাচ্চা দে না তাকে যত দিনই রাখুক না কে

কী লাভ। পুরুতের অবস্থা এমন দাঁড়াল যে সে আর কাউকে না পেয়ে ভগবানের উদ্দেশ্যেই বলতে লাগল, "ভগবান, শেষে তুমি আমার এমন দান পাইয়ে দিলে যে না পারি রাখতে না পারি ফেলতে! তুমি আমার এই উপকার করলে।" সে এসব কথা বলত কিন্তু একবারও তার মনে হল না যে এসবের জন্য সে নিজেই পুরোপুরি দায়ী?

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তাকে এই সমস্ত অসুবিধার হাত থেকে তার বউই রক্ষা করল। সে ছিল খুব বুদ্ধিমতী। সে এতদিন লক্ষ্য করছিল তার স্বামী কি করে না করে।

"আপনি দিন রাত যে ভাবে মাথা গুঁজে ভাবছেন তাতে আমি রীতিমত অবাক হচ্ছি। এবার আমি যা ভেবেছি সেই মত কাজ করুন, দেখবেন আপনার সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।" পুরুতের বউ বলল।

"বল, তাই করা যাবে।" পুরুত বলল।

"যে দামে পারেন আপনি এই গরু-গুলোকে বিক্রি করে দিন। যা টাকা পাবেন তা দিয়ে আপনি দু-একটা ভাল দুধালো গরু কিনুন। এবার থেকে যারা গরু দান করতে চাইবে তাদের বলুন যে তারা যত টাকা দিয়ে গরু কিনতে চায় তত টাকা যেন আপনার হাতে দেয়। আপনি টাকা নিয়ে আমাদের একটা গরু নিয়ে তিন দিন আগে ওদের হাতে দিয়ে আসুন। এই ভাবে কিছু টাকাও ঘরে আসবে, দুধালো গাইও আসবে, কোন সমস্যাই আর থাকবে না।" পুরুতের বউ সব কথা বুঝিয়ে বলল।

বউএর কথায় পুরুতের ভরসা এল। সেইদিন রাত্রে সে তার অনেকগুলো গরু এক কষাইয়ের কাছে বিক্রি করে দিল। দুএকটি রাখল। তারপর ভাল দুধালো গাই কিনে প্রত্যেকদিন দুধ বিক্রি করে, পুরুতগিরি করে অনেক রোজগার করল। এই ভাবে চলার ফলে সে বাকি জীবন ভালভাবেই কাটিয়ে যেতে পারল।

সবার উপরে

প্রাচীনকালে রত্নাকর দেশে মণিকণ্ঠ নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি বিচক্ষণ রাজা ছিলেন। তার ফলে তাঁর রাজ্য বিস্তার লাভ করেছিল। রাজ্য বড় হয়ে যাওয়ার ফলে রাজা রাজ্যের কোন কোনে কি ঘটছে তার সঠিক খবর রাখতে পারতেন না।

এই অবস্থায় মন্ত্রীদের পরামর্শে রাজা গোটা দেশটাকে চারটি ভাগে ভাগ করে দিলেন। এবং প্রত্যেক ভাগে শাসন পরিচালনার জন্য এক একজনকে ভার দিলেন। যাদের নিযুক্ত করলেন তারা হল ঐ ভাগের প্রতিনিধি।

প্রতিনিধিগণ মাসে মাসে তাদের প্রত্যেকের ভাগের সাধারণ মানুষের সুখ সুবিধা ও অসুবিধার কথা নিয়মিত জানাতে লাগল।

রাজপ্রতিনিধিগণ রাজার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা এবং ভক্তি পোষণ করল। তবুও কিছুদিন পরে ওদের প্রত্যেকের মধ্যে স্বাবলম্বী হওয়ার ও নিজের নিজের ভাগের বেশি উন্নতি করানোর ইচ্ছা প্রবল থেকে প্রবলতর হতে লাগল। নিজেদের ভাগের উন্নতি করার উদ্দ্যেশ্যে তারা নিজের নিজের সীমানায় জিনিস চলাচল নিয়ন্ত্রণ করল।

ফলে গোটা দেশের মানুষের মধ্যে যে ঐক্য ছিল তা পরিবর্তিত চার ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। ফলে এক অংশের লোকের সঙ্গে অন্য অঃশের লোকের ছোটখাট ব্যাপারে ঝগড়া লেগে যেত। কিন্তু যেহেতু চার ভাগের মূল শাসনভার এক রাজার অধীনেই ছিল সেইহেতু ঝগড়া বেশি দূর গড়াতে পারত না। রাজা মণিকণ্ঠ চাপা দিতেন।

কিন্তু চার ভাগের চার রাজপ্রতিনিধি

তারাপদ সেনগুপ্ত

যে যার ভাগে নিজেদার ক্ষমতার লড়াই চালিয়ে যেত। এবং সুযোগ পেলেই তারা জাতি বৈষম্য জাগিয়ে অনৈক্যের চেষ্টা করত।

ব্যাপারটা গড়াতে পড়াতে এত দূর গেল যে এক প্রান্তের লোক অন্য প্রান্তে যাতে খাদ্য বা অন্য কোন জিনিস না নিয়ে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করল প্রতিনিধিরা। রাজ্যের উত্তর ভাগে ভাল তুলো হত আর কাপড় বোনার বিষয়ে দক্ষ কারিগর ছিল দক্ষিণ প্রান্তে। কাপড় বোনার ব্যবস্থাও ছিল দক্ষিণে। আগে দক্ষিণের লোক সহজেই তুলো পেত এবং কাপড় বুনত। কিন্তু উত্তরের রাজপ্রতি- নিধি দক্ষিণে তুলো চালান করতে রাজী না হওয়ায় দক্ষিণের লোক কাপড় বুনতে পারছিল না। প্রতিনিধি উত্তরের লোককেই কাপড় বুনতে বলল। ওরা কোনদিন কাপড় বোনেনি। তুলো চাষ করার পদ্ধতিই তারা পুরুষানুক্রমে উন্নত করে এসেছে। এইসব কারণে যেখানে তুলো হত সেখানে কাপড় বোনা হয়ে ওঠেনি আর যেখানে কাপড় বোনা হত সেখানে তুলো চাষ হতে পারেনি। ফলে সারা দেশে বস্ত্র সংকট দেখা দেয়। একই অবস্থা দেখা দিল লোহার ক্ষেত্রেও। দেশের পূর্বাঞ্চলের লোহার খনি ছিল অনেক। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে দক্ষ কারিগর ছিল। পূর্বাঞ্চলের রাজপ্রতিনিধি পশ্চিমাঞ্চলে যাতে লোহা পাচার না হয় তার ব্যবস্থা করল এবং সেখানকার লোককে লোহার জিনিস তৈরি করার জন্য বাধ্য করল। ফলে পশ্চিমাঞ্চলের রাজপ্রতিনিধি অন্য দেশ থেকে বেশি দাম দিয়ে লোহা কিনতে লাগল। ফলে পশ্চিমাঞ্চলের লোকের লোহা কিনতে খরচ বেশি পড়ত।

মাসে মাসে যে খবর রাজা মণিমন্ত পেতেন তাতে তাঁর মনে হত রাজপ্রতি- নিধিরা নিজেদের অঞ্চলের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। কিন্তু বছর

শেষে হিসেব করে তিনি বুঝতেন যে দেশের উন্নতি বলতে যা বোঝায় তা ঠিক হচ্ছে না। গলদ যে আছে কোথায়, কি ভাবে যে গলদ ঢুকেছে এসব ধরেও যেন ঠিক ধরতে পারছিলেন না।

দেশটা চার ভাগে ভাগ করে রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত করে পাঁচ বছর হয়ে হয়ে গেল। পাঁচ বছরে দেশের উন্নতি হওয়া তো দূরের কথা অবনতিই ঘটতে লাগল। কেমন যেন এক অচলাবস্থা দেখা দিল দেশের প্রত্যেকটি অংশে। রাজা ভাবতে লাগলেন কি করা যায়।

এর আসল কারণ যে কি তা ধরার জন্য রাজা মণিকণ্ঠ বিভিন্ন গোষ্ঠীকে ডেকে পাঠালেন রাজধানীতে। তাদের এ বিষয়ে নিজেদের বক্তব্য পেশ করতে বললেন। কিন্তু তাদের কথা বা ভাষণ শুনেও রাজা ধরতে পারলেন না কেন দেশের বিকাশ হচ্ছে না। ব্যবসাদার গোষ্ঠীর ভাষণ শোনার পর রাজা মণি-কণ্ঠ পণ্ডিতগোষ্ঠীকে ডেকে পাঠালেন। ঐ গোষ্ঠীর মধ্যে অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে ইতিমধ্যেই রাজার কাজ থেকে পুরস্কার প্রাপ্ত শশিভূষণও ছিল।

রাজা শশিভূষণকে প্রশ্ন করলেন, "পণ্ডিত মশাই, আমি আপনাকে আজ কোন কঠিন প্রশ্ন করব না। আমার

মাথায় অনেক দিন ধরে একটা সহজ প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, আপনি কি আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন ?"

"প্রশ্ন করুন মহারাজ। আমি সঠিক জবাব দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করব।" শশিভূষণ জবাব দিল।

"এই বিশ্ব সংসারের সব কিছুর স্রষ্টা ভগবান। আপনি কি বলতে পারেন ভগবানের চেয়ে বড় কেউ আছে ?" রাজা মণিকণ্ঠ প্রশ্ন করলেন।

"কেন থাকবে না মহারাজ। ভগ-বানের চেয়ে বড় হল মানুষ।" শশি-ভূষণ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল।

রাজা অবাক হয়ে বললেন, "প্রশ্নের

জবাব শুধু কথায় দিলেই তো হবে না, প্রমান চাই।"

শশিভূষণ সবিনয়ে বলল, "আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার ভিত্তিতেই আমি এ কথা বললাম। মহারাজ ভগবান আমার কপালে লিখে ছিলেন পণ্ডিত হওয়ার কথা। তার ভিত্তিতে আমি উত্তরাঞ্চলে পণ্ডিতি করে দিন যাপন করছিলাম। কিন্তু যেহেতু আমি পূর্বাঞ্চলের লোক সেইহেতু আমাকে ঐ অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। ফলে আমি এখন বেকার। তাই বলছি ভগবান আমার কপালে যে রেখা টেনে ছিলেন মানুষ মুছে দিতে পেরেছে সেই রেখা। এখন আপনিই বলুন মহারাজ যারা আমাকে পূর্বাঞ্চলে পাঠিয়ে দিয়েছে তারা বড় না ভগবান বড় ?"

শশিভূষণের কথা শুনে রাজার চোখ খুলে গেল। আগে তো এসব হত না। দেশ ভাগ করে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করার ফলেই কি এরকম হয়েছে ? রাজার মনে প্রশ্ন জাগল। রাজা মন্ত্রীদের নিয়ে আবার বসলেন। দীর্ঘ আলোচনা হল। মন্ত্রীরা শেষে বলল, "মহারাজ, বড় রাজ্যকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা ভুল হয়নি। ভুল হয়েছে যে অংশের নিবাসীকে সেই অংশের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করা। আমাদের রাজ প্রতিনিধিরা যে একেবারে খারাপ লোক সে কথা বলছি না। তবে এক প্রান্তের অধিবাসীকে অন্য প্রান্তের প্রতিনিধি করলে বোধ হয় ভাল হত। অতএব, প্রতিনিধিদের স্থান পরিবর্তন করে দিতে পারেন। মনে হয়, এর ফলে সমস্যার সমাধান হবে। দেশবাসীও হয়ত তখন দেশের ঐক্যের কথা মনে রেখে কাজ করবে। এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে যে বিরোধ দেখা দিয়েছে তা আর থাকবে না। ফলে সহযোগিতার মনোভাব দেখা দেবে। রাজা মন্ত্রীদের এই প্রস্তাব কার্যকরী করে দেশের উন্নতির পথের বাধা দূর করে দিলেন।

সাত ঘড়া সোনা

এক গ্রামে ছিল এক ব্যবসায়ী। ব্যবসাদার হিসেবে খুব বড় হওয়ার তীব্র বাসনা জাগে তার মনে। কিন্তু কি ভাবে যে তাড়াতাড়ি বড় লোক হওয়া যায় সেই কৌশল তার জানা ছিল না।

একদিন সে মালপত্তর কিনতে শহরের দিকে রওনা হল। কড়া রোদে একটু জিরিয়ে নেবার জন্য সে একটি গাছের নিচে বিশ্রাম করতে লাগল। ঠিক তখন গাছের উপর থেকে একটি কণ্ঠস্বর শোনা গেল: "সাত ঘড়া সোনা চাও?"

ব্যবসায়ী উপরের দিকে তাকিয়ে দেখে কেউ নেই গাছের উপর। তখন সে সেদিকে তাকিয়েই বলল, "মশাই, আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা আপনি কে বলছেন। আপনি যদি সত্যি অনুগ্রহ করে দিতে চান তো দিন না সাতঘড়া সোনা। যত তাড়াতাড়ি পারেন সোনা পাইয়ে দিন।"

এই কথার জবাবে গাছের উপর থেকে শোনা গেল, "এখন সোজা বাড়ি গিয়ে দেখ, বাড়িতে দেখতে পাবে সাতঘড়া সোনা।"

ব্যবসায়ী সেই মুহূর্তে ছুটতে ছুটতে এল বাড়িতে। এসে দেখে সত্যি সত্যি সাতটি ঘড়া রয়েছে এবং প্রত্যেকটাতে সোনা রয়েছে। তবে ছটা ঘড়া সোনায় ভর্ত্তি ছিল। একটি ঘড়াতে অর্দ্ধেক সোনা ছিল। এতে যেন তার মন ভরল না। চিন্তা করতে লাগল কি করে ঐ ঘড়া বাকি অর্দ্ধেক সোনা দিয়ে ভরা যায়। অনেক ভেবে ঠিক করল সপ্তম ঘড়াটা সে নিজেই ভরে দেবে।

ব্যবসায়ী পরক্ষণেই বউয়ের গা থেকে সমস্ত অলঙ্কার নামিয়ে ঘড়ায় ঢেলে দিল। কিন্তু তাতে ঘড়া ভরল না।

শৈলেন্দ্র মজুমদার

ছুটে গেল সেই গ্রামের বড় জমিদারের কাছে। এই জমিদারের সঙ্গে ব্যবসায়ীর বন্ধুত্ব ছিল ছেলে বেলা থেকেই। সে এই জমিদারকে বলল, "আমি ভাই ভীষণ এক বিপদে পড়ে গেছি, তুমি যত টাকা পার ধার দাও।"

তারপর জমিদারের কাছে অনেক টাকা ধার নিয়ে সে ঐ টাকা দিয়ে সোনা কিনে ঘড়ায় পুরে দিল সেই সোনা। কিন্তু তাতেও ঘড়া ভরল না। তারপর ব্যবসায়ী ফ্যান খেয়ে, ছেঁড়া জামা কাপড় পরে পয়সা জমিয়ে সোনা কিনে ঘড়ায় ভরতে লাগল। ফলে তার শরীর ভেঙ্গে গেল। তাকে মনে হত যেন সে ফকির হয়ে গেছে। শেষ হয়ে গেছে।

শেষে এমন অবস্থা হল যে ব্যবসায়ীটি ভিক্ষে করতে লাগল। তাকে ভিক্ষে করতে দেখে একদিন তার বন্ধু জমিদার অবাক হয়ে গেল। জমিদার ভেবে পেল না, যার জমি ছিল, ব্যবসা ছিল, সে কেন ভিক্ষে করছে। জমিদার ঐ ব্যবসায়ীকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "ওহে কী ব্যাপার বলত? ভুলে তুমি ঐ সাতঘড়ার ফেরে পড়নিতো?"

ব্যবসায়ী অবাক হয়ে বলল, "কি ব্যাপার, আমার গোপন ব্যাপার তুমি জানলে কি করে?"

"তোমার অবস্থা দেখেই বুঝতে পারছি। এর আগে অনেকে ঐ সাত ঘড়ার ফেরে পড়ে শেষ হয়ে গেছে। কেউ সুখী হতে পারেনি। তুমি ভাল চাওতো এক্ষুনি ওগুলোর হাত থেকে মুক্ত হও। না হলে মারা পড়বে।" জমিদার বলল।

ব্যবসায়ী সেই মুহূর্তে ঐ গাছের কাছে গিয়ে চিৎকার করে বলল, "এই যে শুনছেন, আমি ঐ সাত ঘড়া সোনা চাইনা। আপনি নিয়ে যান।"

সে বাড়ি ফিরে দেখে ঐ সাত ঘড়ার মধ্যে একটি ঘড়ার সঙ্গে ব্যবসায়ীর নিজস্ব সোনাও গেল। লোভে পড়ে ব্যবসায়ীটি নিজের যা কিছু ছিল তাও হারাল।
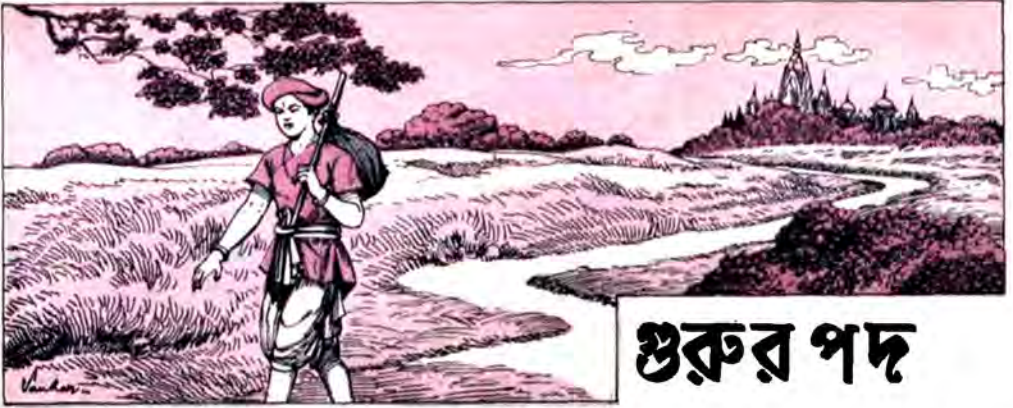
গুরুর পদ

প্রাচীন কালে কাশীর বিদ্যাপীঠ ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে গণ্য হত। রাজা মাধববর্মার আমলে নিগমশর্মা ছিলেন ঐ বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ। সমস্ত শাস্ত্রে তিনি পারঙ্গম ছিলেন। বিদ্যার সাগর ছিলেন তিনি। তাঁর কোন অহঙ্কার ছিলনা। তাঁর কাছে যে ছাত্র আসত তাকে তিনি খুব স্নেহ করতেন ও আন্তরিকভাবে লেখা পড়া শেখাতেন।

তাঁর যতগুলো ছাত্র ছিল তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল রাজশেখর। সে ছিল খুব বুদ্ধিমান। তবে রাজশেখরের চোখ নিবদ্ধ ছিল আচার্যের পীঠের উপর। সে তার সতীর্থদের সঙ্গে মেলা মেশা করত না, তাদের সঙ্গে তেমন কথাও বলত না। সব সময় সে কী যেন ভাবত। আপন মনে ঘুরে বেড়াত। তবে লেখা পড়ায় সে ছিল সবার সেরা।

লেখা পড়া যত শেষ হয়ে এল ঐ আচার্যের পীঠের উপর তার আকাঙ্খা তত তীব্র হতে লাগল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, যে কোন ভাবে আচার্যের পদ দখল করতেই হবে।

ওখানকার লেখা পড়া শেষ করে প্রত্যেক ছাত্র যে যার বাড়ি ফিরে গেল। রাজশেখর কিন্তু বাড়ি ফিরে গেলনা। সে দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল। দেশে দেশে ঘুরে সে জানতে চায় কোন বিষয়ে তার জ্ঞানের অভাব আছে কিনা। অভাব থাকলে সে তা পূরন করে নিতে চায়।

ঘুরে ঘুরে তার ধারনা হল যে তার জ্ঞান পুরোপুরি হয়েছে। তখন সে ঠিক করল বিভিন্ন রাজপ্রাসাদে যাবে। পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করবে। তাই করল রাজশেখর। বিভিন্ন রাজপ্রাসাদে গিয়ে পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা ও তর্ক

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

করল। তারপর তার ধারনা হল যে সে যেকোন পন্ডিতের চেয়ে কোন বিষয়ে কম জ্ঞান রাখে না।

শেষে সে কাশীতে ফিরে এসে মাধব-বর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে বলল, "মহারাজ, আমি সমস্ত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। সমস্ত রাজপ্রাসাদে ঘুরে আমার ধারনা হয়েছে যে আমার চেয়ে বড় পণ্ডিত দেশে আর নেই। এখন আমি জানতে চাই আপনার প্রাসাদে কি এমন কোন পণ্ডিত আছেন যিনি আমাকে নতুন কোন বিষয়ে জ্ঞান দিতে পারেন ?"

রাজপ্রাসাদের পন্ডিতদের সঙ্গে আলো-চনার অনুমতি রাজশেখরকে রাজা দিলেন। এই সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার করে রাজশেখর প্রাসাদের সমস্ত পণ্ডিতকে পরাজিত করে। ফলে তার অহঙ্কার আরও বেড়ে যায়।

তারপর সে রাজা মাধববর্মাকে বলল, "মহারাজ, আমি প্রমাণ করেছি যে আমিই শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। অতএব, আমাকে কাশীর বিদ্যাপীঠের আচার্যের পদ পাইয়ে দিন।"

রাজা পন্ডিত নিগমশর্মাকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁকে রাজশেখরের প্রস্তাবের কথা জানালেন। শুনে নিগমশর্মা রাজ-শেখরকে বলল, "বাবা, শুনলাম, তুমি সমস্ত পন্ডিতদের তর্কে পরাজিত করে কাশীর বিদ্যাপীঠের আচার্যের পদ চেয়েছ, এতে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি। আমি কোন দিন বুঝতে পারিনি যে ঐ আচার্য পদ ও তোমার মধ্যে আমি একটি বাধা হয়ে আছি। এখন, তুমি বাবা, আমাকেও তর্কে পরাজিত করে ঐ পদ সানন্দে গ্রহণ কর।"

পরের দিন রাজশেখর ও মিগমশর্মার মধ্যে তর্কের অনুষ্ঠান হল। প্রথম প্রথম মনে হল রাজশেখর নিশ্চিত যে সে জয়ী হবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে রাজশেখরকে ঝিমিয়ে পড়তে দেখা গেল। শেষে নিগমশর্মার অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে

পারল না রাজশেখর। রাজপ্রাসাদের লোক বার বার নিগমশর্মাকে প্রশংসা করতে লাগল।

একদিন আগে যে প্রাসাদে রাজশেখর গর্বে মাথা উঁচু করে দাপট দেখিয়ে ছিল সেই প্রাসাদে সেদিন রাজশেখর খুব অপমান বোধ করতে লাগল। সেই পরিবেশ তার কাছে ভীষণ অসহ্য লাগল। হঠাৎ সে প্রাসাদ থেকে উঠে চলে গেল কারোর সঙ্গে কথা না বলে।

সেখান থেকে বেরিয়ে সে সোজা হিমালয়ে চলে গেল। সেখানে টানা দু বছর সরস্বতীর সাধনা করে বসে রইল। সরস্বতী তুষ্ট হয়ে তাকে সম্পূর্ণ জ্ঞান দান করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে রাজশেখরের মধ্যে এক বিচিত্র পরিবর্তন দেখা দিল। তৎক্ষণাৎ কাশী ফিরে সোজা বিদ্যাপীঠে গিয়ে ঐ আচার্যের পায়ে পড়ে প্রণাম করে রাজ-শেখর বলল, "হে আচার্য আমার অহঙ্কারের জন্য অপরাধ করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন আচার্য।"

নিগমশর্মা দুহাতে রাজশেখরকে ধরে তুলে, "বাবা রাজশেখর, তুমি যখন ছাত্র ছিলে তখন থেকেই তোমার মন লেখা পড়ার চেয়ে ঐ পদের উপর ছিল। এটা আমার চোখে ধরা পড়ে ছিল। অন্যান্য ছাত্রদের তুলনায় অনেক ভাল ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও এই জন্যই তোমার পূর্ণ জ্ঞান তখনই হয়নি। তোমার অহঙ্কার দূর হয়েছে দেখে আমার এখন ধারণা হয়েছে যে তোমার জ্ঞান লাভ পূর্ণ হয়েছে।

পরের দিন রাজশেখরকে নিয়ে নিগম-শর্মা মাধববর্মার প্রাসাদে গেলেন। রাজাকে বললেন, "মহারাজ, কাশী বিদ্যাপীঠের আচার্য পদ একেই আমি দিতে চাই। আমি বৃদ্ধ হয়েছি। আমি আর পারছি না। এখন আমি বানপ্রস্থে যেতে চাই।"

রাজা নিগমশর্মার প্রস্তাব গ্রহণ করে রাজশেখরকে আচার্য পদ দিলেন।

সোমনাথের বুদ্ধি

সপ্তগড়ের রাজকুমারের নাম স্বর্ণকুমার। সে একদিন উদ্যানে বেড়াচ্ছিল। সেই সময় তাকে ভোমরা কাটে। রাজদম্পতির কোন সন্তান অনেক কাল ছিল না। বহু বছর পরে একটি পুত্র সন্তান হওয়ায় তাকে অত্যন্ত আদরে তারা লালন পালন করতে লাগল। স্বর্ণকুমারের বয়স তখন মাত্র আট বছর। রাজা ও রাণী সব সময় তাকে চোখে চোখে রাখত। যেদিন ভোমরা কামড়ে ছিল সেদিন সে কিন্তু একা ছিলনা। বাবা মাও ছিল উদ্যানে। ভোমরার কামড় খেয়ে স্বর্ণকুমার বাবারে-মারে বলে আর্তনাদ করতে লাগল। চাকররা তক্ষুনি তাকে ধরাধরি করে রাজমহলে নিয়ে গেল। দরবারের বৈদ্য দিয়ে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হল। কিছুক্ষণ পর রাজকুমার আরাম বোধ করল।

সেই রাত্রে রাণী একটি স্বপ্ন দেখল। স্বপ্নে এক দেবতা তাকে বললেন, "রাণী, তোমার ছেলের ব্যাপারে সতর্ক হও। ওকে যে ভোমরা কামড়েছে সেটা সাধারণ ভোমরা নয়। ঐ ভোমরার কামড় যে খাবে সে দিনে দিনে কমতে থাকবে। তার শরীর দিনকে দিন কমে শীর্ণকায় হয়ে অবশেষে সে..."

"মহাত্মা, তাহলে কি উপায়?" রাণী জিজ্ঞেস করল। কিন্তু দেবতা এই প্রশ্নের জবাব না দিয়েই অন্তর্ধান হলেন। রাণী ভয় পেয়ে চমকে উঠে পড়ল। সে তৎক্ষণাৎ রাজাকে তুলে স্বপ্নের ব্যাপার সবিস্তারে জানাল।

"স্বপ্ন নিয়ে অত ভাবছ কেন? স্বপ্ন স্বপ্নই। কোনদিন কি কেউ দেখেছে যে স্বপ্ন সত্য হয়েছে?" রাজা অনেক বুঝিয়ে বললেন। তা সত্ত্বেও রাণীর মনে শান্তি

এ.সি. সরকার (জাদুকর)

হল না। পরের দিন রাণী স্বর্ণকুমারকে ওজন করিয়ে দেখেন যে তার ওজন কমে গেছে। এইভাবে দুচার দিনের মধ্যে ছেলের ওজন নিয়ে দেখা গেল তার ওজন আরও কমে গেছে। ক্রমশ রাজকুমার দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। স্বপ্নে যে কথা শুনে ছিল রাণী বাস্তবেও তাই হতে লাগল।

এর ফলে রাণীর মনে দারুন দুশ্চিন্তা ঢুকল। রাজাও চিন্তা না করে পারলেন না। রাজার দু-খ দেখে তাঁর মন্ত্রীরাও দুঃখ পেল।

এই ভাবে রাজকর্মচারীদের মধ্যে অনেকেই দুঃখ পেল। বৈদ্যরা দলে দলে এসে রাজকুমারের চিকিৎসা করতে লাগল। অনেক রকমের পুজো হতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। রাজকুমার দিনকে দিন দুর্বল হতে থাকে।

ঐ দেশের মধ্য এক অঞ্চলে ঘন বনে থাকত এক তান্ত্রিক। তার নাম চণ্ডপাণী। ভূত পিশাচদের নামানোর ব্যাপারে তার খুব নাম ছিল। রাজার নির্দেশে রাজ কর্মচারীরা একবার ঐ বনে গিয়ে রাজার ইচ্ছা প্রকাশ করল তার কাছে। স্বর্ণ-কুমারের অবস্থা চণ্ডপাণীকে জানানো হল। তাকে সারিয়ে তুলতে হবে। অবিলম্বে চণ্ডপাণীকে যেতে হবে।
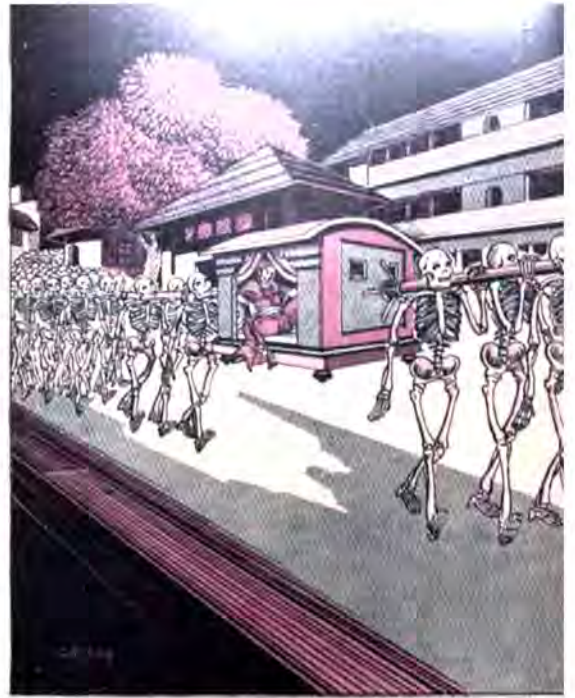
চণ্ডপাণী জানাল যে সে শনিবার মধ্যরাত্রে রাজপ্রাসাদে যাবে। তবে সেই সময় এক হাজার লোকের খাবার যেন প্রস্তুত থাকে। কেউ যেন বাড়ির বাইরে না থাকে। পথে যেন কারো বাড়ির আলো না পড়ে। দরজা জানলা যেন বন্ধ থাকে।

নির্দিষ্ট সময়ে চণ্ডপাণী মানুষের কঙ্কাল বাহিত পালকি করে রাজার কাছে এল। ছটা মানুষের কঙ্কাল পালকি বহন করে আনল। ঐ পালকির পিছনে পিছনে এক হাজার কঙ্কাল এল। ঐ কঙ্কালগুলো খাওয়া দাওয়া করে সারা রাত নাচ গান করে সকালে পালকি নিয়ে গায়েব হয়ে গেল।

তারপর চণ্ডপাণী রাজ মহলে জোরে জোরে বলল, "কোই, রাজা কোই? এবার আসুন।"

রাজা বেরিয়ে এসে বললেন, "আপনি দরজা জানলা বন্ধ করে থাকতে বললেন তাই আর বেরোতে পারিনি। আপনি দয়া করে ভিতরে আসুন।"

"কোই, আপনার ছেলে কোথায়? আগে আপনার ছেলেকে দেখান।" বলল চণ্ডপাণী।

চণ্ডপাণীকে অন্দরমহলে নিয়ে যাওয়া হল। চণ্ডপাণী অন্দরমহলে ঢুকেই কিসের যেন গন্ধ পেয়ে বলল, "উঁ, আমি আগেই ভেবে ছিলাম। ঐ পিশাচটাই রাজকুমারের ভিতরে ঢুকে গেছে। আর আমি ওকে ছাড়ব না। এবার তাকে দেখে নিতে হবে। তাকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে।"

তারপর রাজার দিকে ঘুরে বলল, "এই দুষ্ট পিশাচিণীর কাহিনী আপনাদের শোনা উচিত।"

চণ্ডপাণী ঐ পিশাচিণীর কাহিনী শুরু করল, "প্রাচীনকালে সিদ্ধবনে এক রাক্ষসী থাকত। হ্রীতি নামে এক মেয়ে ছিল তার। তখন ঐ বনে আমি ছিলাম ধ্যানমগ্ন। বার বার বারন করা সত্ত্বেও হ্রীতি আমাকে অন্যমনস্ক করার চেষ্টা করতে লাগল। বার বার আমার ধ্যানভঙ্গ করার চেষ্টা করল। কিছুতেই যখন সে আমার কথা শুনল না তখন আমি তাকে অভিশাপ দিয়ে মানুষের মুণ্ডুসহ মোষে রূপান্তরিত করলাম। কিন্তু তার পরেও আমাকে সে ছাড়ল না। সব সময় আমার পিছনে লেগে থাকত। তখন আমি আবার তাকে অভিশাপ দিয়ে ভোমরা করে ফেললাম। ঐ ভোমরাকে আমার জায়গা থেকে তাড়িয়ে এই দেশে পাঠিয়ে দিয়ে ছিলাম। এত সত্ত্বেও ঐ পিশাচ তার অভ্যেস ছাড়তে পারল না। স্বর্ণকুমারকে কামড়ে সে অন্যায় করেছে বটে তবে হ্রীতি অনেক দিন কষ্ট ভোগ

করেছে। অনেক শাস্তি পেয়েছে। এখন তাকে সাবধান করে দিয়ে মুক্ত করতে হবে। এখন আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করব, স্বর্ণকুমারের এই রোগ সারানোর কোন ওষুধ আছে কিনা।"

একথা বলে চণ্ডপানী আগুন ধরিয়ে দিল। সেই আগুনে সুগন্ধী দ্রব্য ঢেলে দিল। ধোঁয়া উঠল। ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাতে লাগল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ঐ কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী থেকে একটি কালো ভোমরা বেরিয়ে এল। চণ্ডপানীর মন্ত্র পাঠের ফলে ধোঁয়ার কুণ্ডলী থেকে ভোমরা বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে তাকে জিজ্ঞেস করল, "ওরে দুষ্ট, তুই এখনও তোর দুষ্ট বুদ্ধি ত্যাগ করতে পারলি না। এই রাজকুমারকে তুই কামড়ে দিলি?"

ভোমরা মানুষের স্বরে বলল, "মহাত্মা আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার ইচ্ছ ছিল আপনাকে এখানে ডেকে পাঠানোর সেইজন্যই আমি রাজকুমারকে কামড়েছি। এখন আপনি এসেছেন আমার ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। এর ওষুধের কথা বলছি এবার। প্রত্যেকদিন অগ্নি-গুল্মের রস এক ঘটি করে খাওয়ালে স্বর্ণকুমার সেরে উঠবে। রাজকুমার সেরে উঠলে আপনি আমাকে রূপান্তরিত করুন। এটাই আমার অনুরোধ।"

"তোর অনুরোধ রাখব। রাজকুমার সেরে ওঠার সাথে সাথে তোর অভিশাপ

লুপ্ত হবে।" চণ্ডপানী বলল। তৎক্ষণাৎ ভোমরা চণ্ডপানীর পায়ে পড়ে প্রণাম করে সশব্দে উড়ে গেল।

চণ্ডপানী দরবারী বৈদ্যকে ডেকে পাঠিয়ে বলল, "আপনি কি অগ্নিগুল্মের নাম শুনেছেন? চেনেন ওটা?"

"আজ্ঞে জানি। আমাদের উদ্যানের এক কোণে অনেক আছে।" বৈদ্য জবাবে বলল।

"ভাল কথা। তাহলে ভোমরার কথা অনুযায়ী রাজকুমারের চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। আমার আশীর্বাদে স্বর্ণকুমার তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে বলে আমার দৃঢ়-বধ্য ধারণা। আর আমাকে জ্বালাবেন না।" বলে সকলের সামনেই চণ্ডপানী অন্তর্ধান হলেন।

অগ্নিগুল্ম এনে তার রস নিংড়ে সেই রস নিয়ে বৈদ্য রাজকুমারের ঘরে গেল। রসপূর্ণ পাত্রটি রাজকুমারের সামনে রেখে বৈদ্য বলল, "রাজকুমার এই ওষুধটা খেয়ে নাও। তোমার অসুখ সেরে যাবে।"

ঐ রসের রং ছিল কালো। ঐ রসের দিকে তাকিয়ে নাক কুঁচকে রাজকুমার বলল, "ছি ঐ কালো বিচ্ছিরি রঙের ওষুধ আমি কিছুতেই খাব না। নিয়ে যাও ঐ ওষুধ। চলে যাও আমার সামনে থেকে।" কালো রঙের প্রতি রাজকুমারের ঘৃণা ছিল। রাজকুমারকে বোঝানোর জন্য কত চেষ্টা চলল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। ঐ ওষুধ নিয়ে স্বর্ণকুমারের কাছে কেউ যেতেই পারছিল না, খাওয়ানো তো দূরের কথা। অন্য কোন রঙ মিশিয়ে দিলে ওষুধের গুণ কমে যাবে ভেবে কেউ সে কাজ করতে সাহস করল না।

রাজপ্রাসাদের সবাই চিন্তিত, সকলের এক চিন্তা কি করে ঐ ওষুধ স্বর্ণকুমারকে খাওয়ানো যায়।

ইতিমধ্যে দুদিন কেটে গেল। রাজ-কুমারের ওজন আরও কমে গেল। শেষে তৃতীয় দিনে রাজপ্রাসাদে জাদুকর

ামনাথ বলল, "মহারাজ, আমি এক-
ার চেষ্টা করে দেখি।"

"তুমি জাদুর সাহায্যে ওকে ওষুধ
াওয়াবে?" রাজা প্রশ্ন করলেন।

"চেষ্টা করে দেখব মহারাজ। লাভ
া ক্ষতি নেই।" জাদুকর বলল।

"বেশ চেষ্টা করে দেখ। সফল হলে
রস্কার পাবে।" রাজা বলল।

"দেখি আমি আর বিলম্ব করব না।"
ক্ষুণি কাজে হাত দিচ্ছি।

স্বর্ণকুমার জাদুকর সোমনাথকে খুব
াল বাসত। তার জাদু দেখে মুগ্ধ হত।
ন্তু হঠাৎ সোমনাকে কালো রঙের পাত্র
াতে আসতে দেখে স্বর্ণকুমার তেলে
গুনে চটে গিয়ে বলল, "এ কি
সোমনাথ, তুমিও ঐ কালো পাত্র নিয়ে
আমার সামনে এলে। দোহাই তোমার,
তুমি ঐ পাত্র নিয়ে আমার সামনে আর
আসবে না। তার চেয়ে তুমি আমাকে
একটা নতুন জাদু দেখাও।"

"স্বর্ণকুমার, তুমি ভুল করছ। আমি
কোন দিন তোমাকে বিরক্ত করতে
আসিনি। আমি আজ তোমাকে একটা
নতুন জাদু দেখাতে এসেছি।" সোমনাথ
বলল।

"মিথ্যা কথা। তোমরা সবাই ফিস-
ফাস করে কথা বলে আমাকে ঐ কালো
কালি খাওয়াতে এসেছ। আমি জানি
তোমরা আমার বিরুদ্ধে কি যেন করছ।"
বলে রাজকুমার কেঁদে ফেলল।

"তুমি আবার ভুল করছ। তুমি যেটাকে কালি বলছ সেটা যে কালি নয় তা তুমি নিজের চোখেই এক্ষুণি দেখতে পাবে। এবার তুমি এই পাত্রের দিকে তাকাও।" বলে সোমনাথ পকেট থেকে একটা কালো রুমাল বের করল। কি এক মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে ঐ রুমাল দিয়ে পাত্রকে ঢেকে দিল। ঢেকে রেখেই পাত্রটির গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল। তারপর রুমাল পাত্রের উপর থেকে তুলে ফেলল। রাজকুমার দেখল ঐ কাঁচের পাত্রে রয়েছে মিষ্টি। বড় বড় রসগোল্লা। সোমনাথ ঐ রসগোল্লা রাজকুমারকে খেতে দিল।

স্বর্ণকুমার তৃপ্তির সঙ্গে রসগোল্লা খেয়ে খুব খুশী হল।

"দেখলে তো স্বর্ণকুমার, কালো হলেই যে ভয় পাও এটা তুমি কত ভুল কর। আশা করব এবার থেকে তুমি কালো বলে ঐ ওষুধ খেতে গররাজী হবে না। তৃপ্তি ভরে খাবে।" সোমনাথ বলল।

"বেশ খাব। তবে ওষুধটা তোমাকে আনতে হবে। তুমি না আনলে খাব না।" রাজকুমার বলল।

পরের দিন সোমনাথের হাত থেকে ওষুধ নিয়ে রাজকুমারের খাওয়া দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। এক সপ্তাহের মধ্যে রাজকুমারের রোগ সেরে গেল। সোমনাথ প্রচুর উপহার পেল।

রাজা ও রাণী সোমনাথকে গোপনে জিজ্ঞেস করল, "সোমনাথ, কি করে পারলে স্বর্ণকুমারকে রাজী করাতে?"

সোমনাথ বলল, "পাত্রের ভিতরে রেখে দিলাম রসগোল্লা আর পাত্রের গায়ে লাগিয়ে ছিলাম কাজল। পরে কালো রুমাল দিয়ে কালি পুঁছে ফেলে ছিলাম। কালো রুমালে কাজল মিশে ছিল। রাজকুমার ধরতে পারেনি। পোঁছার সময় বিড় বিড় করেছিলাম। রাজকুমার ভেবেছে মন্ত্রপাঠ করেছি।" শুনে রাজা ও রাণী খুব হাসলেন।

মাধবের বুদ্ধি

উদ্যমপুর গ্রামে একবার চোরের উপদ্রব ভীষণ বেড়ে গিয়ে ছিল। প্রত্যেক বাড়িতে চুরি হয়ে ছিল। রাজা বিশেষ ব্যবস্থা করে প্রত্যেক চোরকে ধরতে পেরে ছিলেন।

কয়েকদিন পরে গাঁয়ের লোক জানতে পারল যে প্রত্যেক বাড়িতে চুরি হলেও মাধবের বাড়িতে চুরি হয়নি। গাঁয়ের লোকের কাছে এ ছিল এক আশ্চর্য ব্যাপার। তারা মাধবের কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, "মাধব, চোরদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তুমি এমন কি ব্যবস্থা করেছ, দয়া করে, আমাদের জানাবে?"

হো হো করে হেসে মাধব বলল, "কিছুই করিনি। তোমরা প্রত্যেকে বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ করে ঘুমিয়ে ছিলে, আমি খোলা রেখে ঘুমোচ্ছিলাম। অত খোলা রেখে ঘুমানোর ফলে চোর ভেবেছিল নিশ্চয় আমার ঘরে কিছু নেই। তাই চোর ফিরেও তাকায়নি আমার বাড়ির দিকে।

শুনে গাঁয়ের মানুষ অবাক হল।

বিদেশী ব্যবসায়ী

এক গ্রামে শিশিরকুমার নামে এক কেরাণী ছিল।

সে এক বেনের সমস্ত ব্যবসা দেখা-শোনা করত। ব্যবসার সব দিক ভাল-ভাবে চালানোর অভিজ্ঞতা শিশিরকুমারের হয়ে গিয়েছিল। সে সব সময় চেষ্টা করত মালিকের যাতে দুপয়সা বেশি লাভ হয়। তাই খোঁজ করে করে যেখানে সবচেয়ে সস্তায় ভাল জিনিস পেত কিনে আনত এবং তা বেশি দামে বিক্রি করত। এইভাবে ব্যবসায়ের অন্যান্য খরচও কমানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল।

কিছুদিন পরে শিশিরকুমারের মালিক মারা গেল।

সমস্ত সম্পত্তির মালিক হল তার একমাত্র পুত্র সোমগুপ্ত। ছেলেটা যেমন ছিল কিপটে তেমনি ছিল ব্যবাসার ব্যাপারে আকাট। তার ধারনা ছিল খরচ কমালে, কিপটেমি করলেই টাকা বেশি জমানো যায়। ব্যবসা করতে গেলে কোন্ খরচটা করা উচিত কোন্ খরচটা করা উচিত নয় সে ব্যাপারে তার কোন ধারনা ছিল না। নিজের খেয়াল খুশী মত সোমগুপ্ত শিশিরকুমারকে যা মুখে আসত তাই বলত।

তবু শিশিরকুমার মাথা নিচু করে কাজ করে যেত।

এত কথা বলা সত্ত্বেও শিশিরকুমারের মাথা নিচু কাজ করা দেখে সোমগুপ্তের সন্দেহ হল নিশ্চয় সে অন্য কোন ভাবে রোজগার করছে, চুরি করছে তা না হলে এত অপমান সহ্য করছে কি করে। সে ভাবল বাপের আমলে শিশিরকুমার তাকে ঠকিয়ে কত টাকা মেরে দিয়েছে কত টাকা করেছে কে জানে।

জনমেজয় কর

এ সব কথা ভেবে সোমগুপ্ত তালে ছিল সুযোগ পেলেই ওকে সরানোর।

মালিক ও কর্মচারীর মধ্যে সন্দেহের বীজ একবার ঢুকলে সেখানে আর বেশি দিন কাজ করা চলে না।

"ভাণ্ডারে দশ বস্তা ধান কম আছে কেন? তিন দিনের মধ্যে এই দশ বস্তার দাম না দিলে আমি বিচারালয়ে তোমার নামে অভিযোগ দাখিল করব। থানায় পাঠাব।" সোমগুপ্ত বলল।

এই অভিযোগে সোমগুপ্ত শিশির-কুমারকে চাকরি থেকে দূর করে দিল। শিশিরকুমার ভেবে পেল না তার কি অপরাধ।

তারপর একদিন এক বিদেশী ব্যব-সায়ী এসে সোমগুপ্তকে বলল, "মহাশয় আমি সমুদ্রপারের লোক। এখানকার জিনিস কিনে আমি ওপারে নিয়ে গিয়ে থাকি। আমি বরাবর সোনা দিয়ে শিশির কুমারের কাছ থেকে আপনাদের জিনিস পত্র কিনে নিয়ে যেতাম। উনি আমার যত জিনিস দরকার হত দিতেন আর আমি যত সোনা চাইতেন দিতাম। তবে মোটামুটি আমি জানি কত জিনিসের দাম কত সোনা। আমি এর আগে অনেকবার এসেছিতো। আমার সব জানা আছে।"

বিদেশী ব্যবসায়ীর কথা শুনে সোম গুপ্ত খুব খুশী হল। এত সোনাদানা শিশিরকুমারের হাতে পড়লে না জানি

কত সোনা মেরে দিত। সে মনে মনে চিন্তা করল।

সেই রাত্রেই বিদেশী ব্যবসায়ী অনেক জিনিসপত্র সোমগুপ্তের কাছ থেকে নিয়ে, সোনার টুকরো দিয়ে চলে গেল। সেদিন রাত্রে সোমগুপ্ত খুব আনন্দে কাটাল। ঘুমের ঘোরে অনেক ভাল ভাল স্বপ্ন দেখল।

কিন্তু পরের দিন ঘুম ভাঙতেই তার মনে সোনার টুকরোর বিষয়ে হঠাৎ খটকা জাগল।

সোনায় খাদ আছে কিনা সন্দেহ জাগল। স্বর্ণকারের কাছে গেল সেই সোনার টুকরোগুলো নিয়ে। স্বর্ণকার কষ্টিপাথরে ঘষে জানিয়ে দিল যে পিতলের টুকরো ওগুলো। সে কথা কানে যেতেই সোমগুপ্ত সেই মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে গেল।

আসলে বিদেশী সেজে যে এসেছিল সে ছিল শিশিরকুমারের ছেলে। বাবাকে সোমগুপ্ত যে ভাবে অপমান করেছিল তার বদলা নিল।

বাড়ি ফিরে এসে সে বাবাকে সবকথা বিস্তারিত জানাল। শিশিরকুমার ছেলেকে খুব বকল।

"তুমি যে সততার সঙ্গে সারা জীবন তাদের কাজ করলে তার কি পুরস্কার পেলেন ?" শিশিরকুমারের ছেলে বলল। জবাবে বাবা বোঝাল। কিন্তু ছেলে কিছুতেই বুঝতে চাইল না। শিশিরকুমার পরের দিন সোমগুপ্তের বাড়ি গিয়ে ঐ সমস্ত জিনিস ফেরত দিয়ে গিয়ে দেখে সে মনমরা হয়ে বসে আছে। সব কথা বলে সব জিনিস তাকে দিয়ে শিশির-কুমার তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল। তখন সোমগুপ্ত বলল, "আপনি কাল থাকলে আমাকে ঠকতে হত না। যাই হোক, আপনি ছাড়া আমার ব্যবসা চলবে না। আপনি আমাকে ক্ষমা করে কাজে যোগদান করুন।"

দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝতে পারিনি।

কাজের জোগাড়

অনিমা দেবী

ান এক গ্রামে চন্দন নামে এক কিষান
েল। সে ভেড়া বিক্রি করে অনেক টাকা
রে ছিল। তার ইচ্ছা জাগল গাঁয়ের
চতে একটা কুয়ো খোঁড়ানোর। কিন্তু
নেক পরিশ্রম করে সংগ্রহ করা টাকা
রচ করে ফেলতে তার ইচ্ছা করছিল
। তার ইচ্ছে কার্যকরী হচ্ছিল না।

ইতিমধ্যে আকাল পড়ে গেল। লোকে
তে পাচ্ছিল না। চন্দন ভাবল, এই
বর্ণ সুযোগ। এই সুযোগে কুয়ো খুঁড়িয়ে
লে খুব কম খরচে কাজ সারা যাবে।
াজও তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে।

অনেকবার ভেবে নিয়ে শেষে ঠিক
রল কুয়ো খোঁড়াবে। আকালের সময়
াজ পেয়ে কুয়ো খোঁড়ার লোক খুব
ী। তাদের নেতা রাজু।

দশবার ফুট খোঁড়ার পর মাটি এমন
র দেখা দিল যে জল দেখা দেবার
সম্ভাবনা আর অত সহজ মনে হল না।
তখন চন্দনের মাথায় হাত পড়ে গেল।
তাহলে তো অনেক দিন কাজ করাতে
হবে। অনেক খরচ পড়ে যাবে। এসব
ভেবে রাজুকে চন্দন বলে দিল, "ওহে,
আপাতত কাজটা থাক। মনে হচ্ছে অত
সহজে জল উঠবে না।"

রাজুর মাথায় হাত। সে তৎক্ষণাৎ
বুদ্ধি খাটিয়ে বলল, "দেখুন, এই মাটির
স্তর বেশি গভীর নয়। আরও অল্প
খুঁড়লেই জল দেখা দেবে। এখন কাজ
বন্ধ করে দিলে কুয়োটা নানান কারণে
বুজে যাবে। ফলে পরে আপনার অনেক
খরচ পড়ে যাবে।" আরও অনেক কথা
বলে রাজু চন্দনকে বোঝাল। চন্দন
সেদিন সন্ধ্যায় কোন কথা না বলে বাড়ি
ফিরে গেল। তার ভাব গতিক দেখে
রাজুর মনে হল অল্প জল ও দেখতে না

পেলে চন্দন আর কাজ করাবে না। তখন সে অন্য পথ ধরল।

সে-রাত্রে রাজু ঘুমোতে পারল না। যে কোন ভাবে আকালের সময় তার মজুত ভাইদের দু-পয়সা পাইয়ে দিতে চায়। তার নিজেরও অভাব কম নয়। শেষে তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সেই রাত্রে গোপনে সে তার কাজের বন্ধুদের সাথে দেখা করে ঐ কুয়োতে এক ঘড়া করে জল এনে ঢালতে বলল।

পরের দিন চন্দন কুয়ো দেখতে গিয়ে লক্ষ্য করে তাতে জল এসেছে। সে খুব খুশী হয়ে রাজুর কাছে ছুটে গিয়ে তাকে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ। আজ সকালে আমি দেখেছি জল আসছে। তোমরা কাজ বন্ধ করো না। জল যখন দেখা দিয়েছে, যতক্ষন না জল ভালভাবে আসে ততক্ষন খুঁড়ে যাও। এস, আবার কাজ শুরু কর।"

"আজ্ঞে, তাতো পারছিনা। অন্য গাঁয়ে যাবার কথা আছে। একটা বড় কাজে হাত দিতে হবে। বছর খানেক ওখানে কাজ করতে হবে।" রাজু বলল।

"তা বললে হয়? কুয়োর কাজ এ হাতে হাওয়াই ভাল। আগে আম কাজটা শেষ করে যেখানে ইচ্ছে যাও চন্দন বলল।

"তাহলে বাবু একটা কাজ করু যেখানে আমরা কাজ করতে যাচ্ছিলা সেখানে ওরা অনেক দিনের মজুরী আ ভাগেই দেবে বলেছিল। আপনি য কিছু টাকা আগে দেন তাহলে আম সাথীদের বুঝিয়ে আপনার কাজ আজকেই ধরতে পারবো।" রাজু বল

চন্দন তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গে রাজুর হাতে কিছু টাকা দিল। তার কাজ শুরু হল। যে জল ওরা গোপ ঢেলেছিল তা অনেক আগেই কুয়ো থে তুলে ফেলা হয়েছে মাটির ঐ স্তর খুঁ তুলতে অনেক দিন লাগল। এই ভা রাজু আকালের সময় নিজেকে ও ত সাথীদের বাঁচাল।
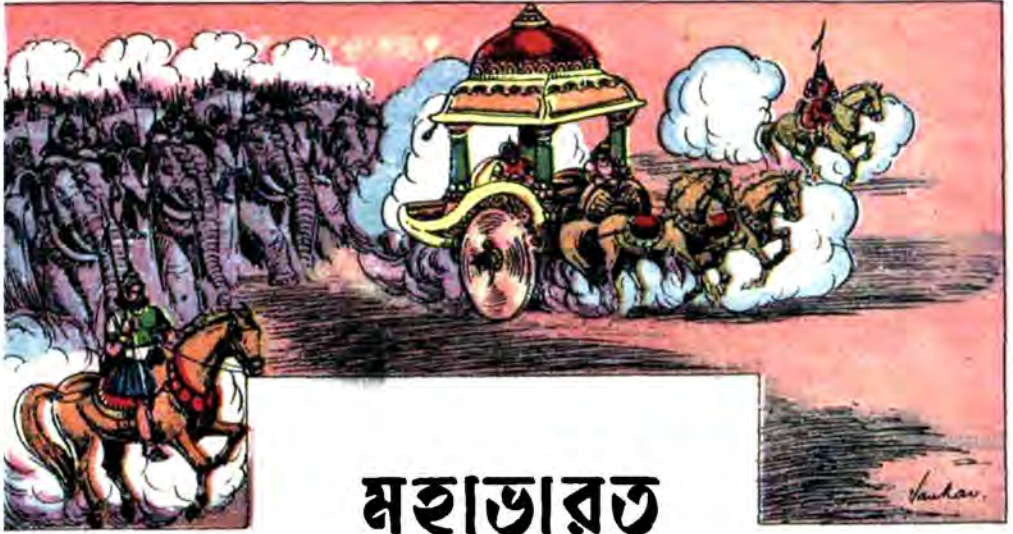
ইরাবানকে নিহত দেখে ঘটোৎকচ ক্রোধে গর্জন করে উঠলেন। ঘটোৎকচের এই অবস্থা দেখে কুরু সেনাদের উরুস্তম্ভ কাঁপতে লাগল এবং শরীর ঘামতে লাগল। দুর্যোধন ঘটোৎকচের দিকে দ্রুত ধাবিত হলেন। বঙ্গ রাজ্যের অধিপতি দশ হাজার হাতী নিয়ে তাঁর পিছনে গেলেন। দুর্যোধনের উপর ঘটোৎকচ বর্ষার জলধারার মত শরবর্ষণ করতে লাগলেন। তাঁর শক্তির আঘাতে বঙ্গাধিপতির বাহন হাতী নিহত হল। ঘটোৎকচ দ্রোণের ধনু ছেদন করলেন। বাহ্লীক চিত্রসেন ও বিকর্ণকে আহত করলেন, এবং বৃহদ্‌বলের বক্ষ বিদীর্ণ করলেন।

এই লোমহর্ষকর যুদ্ধে কৌরব সেনার প্রায় পরাজিত হল।

অশ্বত্থামা অতি দ্রুত এগিয়ে এসে ঘটোৎকচ ও তাঁর অনুচর রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ঘটোৎকচ এক দারুণ মায়া প্রয়োগ করলেন। এর প্রভাবে কৌরবদলের সকলেই দেখল দ্রোণ, দুর্যোধন শল্য ও অশ্বত্থামা রক্তাক্ত হয়ে ছিন্নদেহে ছটফট করছেন। কৌরব বীরগণ প্রায় সকলেই নিপাতিত হয়েছেন, এবং বহু সহস্র অশ্ব ও আরোহী খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে। সৈন্যদল শিবিরের দিকে দ্রুত ধাবিত হল। তখন ভীষ্ম ও সঞ্জয় বললেন, "তোমরা পালিয়ে যেয়ে না। যুদ্ধ কর প্রাণপণ শক্তিতে, যা দেখা

তা সবই রাক্ষসী মায়া।" কিন্তু সৈন্যরা তাঁদের কথা বিশ্বাস করতে পারল না। তারা পালিয়ে গেল।

দুর্যোধনের মুখে এই পরাজয়ের সংবাদ শুনে ভীষ্ম বললেন, "বৎস, তুমি সর্বদা আত্মরক্ষায় সতর্ক থেকে যুধিষ্ঠির বা তাঁর কোনও ভ্রাতার সঙ্গে যুদ্ধ করবে। কারণ, রাজধর্মের নিয়ম অনুসারে রাজার সঙ্গেই রাজা যুদ্ধ করেন।"

তারপর ভীষ্ম ভগদত্তকে বললেন, "মহারাজ, আপনি শীঘ্র হিড়িম্বা পুত্র ঘটোৎকচের কাছে সসৈন্যে গিয়ে তাকে বধ করুন। আপনিই তার উপযুক্ত প্রতিযোদ্ধা।"

ঘটোৎকচের সঙ্গে ভীমসেন, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, চেদিরাজ, দশার্ণরাজ প্রভৃতি ছিলেন।

ভগদত্ত সুপ্রতীক নামক বৃহৎ হস্তীতে আরোহণ করে এলেন এবং ভীষণ-শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন।

ঘটোৎকচ তা জানুতে রেখে ভেঙ্গে ফেললেন। তখন ভগদত্ত সকলের উপর শরবর্ষণ করতে লাগলেন। এই সময়ে অর্জুন তাঁর পুত্র ইরাবানের মৃত্যু সংবাদ শুনতে পেলেন এবং শোকাবিষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষ্ম কৃপ প্রমুখকে আক্রমণ করলেন। ভীমের শরাঘাতে দুর্যোধনের সাত ভ্রাতা অনাধৃষ্টি কুণ্ডভেদী বিরাজ দীপ্ত লোচন দীর্ঘবাহু সুবাহু ও কনকধ্বজ বিনষ্ট হলেন। তাঁদের অন্য ভ্রাতারা ভয়ে পালিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যাকালে যুদ্ধের বিরাম হল, কৌরব ও পাণ্ডবগণ নিজ নিজ শিবিরে চলে গেলেন।

কর্ণ ও শকুনিকে দুর্যোধন বললেন, "ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ শল্য ও ভূরিশ্রবা পাণ্ডবগণকে কেন দমন করছেন না তার কারণ জানিনা, তারা জীবিত থেকে আমার শক্তি ক্ষয় করছেন। দ্রোণের সামনেই আমার ভ্রাতাদের বধ করেছে।"

কর্ণ বললেন, "রাজা, শোক করোনা।

ভীষ্ম যুদ্ধ থেকে সরে যান, তিনি অস্ত্র-ত্যাগ করলেই, তাঁর সামনেই আমি পাণ্ডবদের সসৈন্যে বধ করব। ভীষ্ম সর্বদাই পাণ্ডবদের দয়া করেন। সেই মহারথগণকে জয় করবার শক্তিও তাঁর নেই। অতএব, তুমি তাড়াতাড়ি ভীষ্মের শিবিরে যাও। বৃদ্ধ পিতামহকে সম্মান দেখিয়ে তাঁকে এক্ষুণি অস্ত্রত্যাগ করতে সম্মত করাও।"

দুর্যোধন অশ্বারোহণে ভীষ্মের শিবিরে চললেন। তাঁর ভ্রাতারাও সঙ্গে গেলেন। ভৃত্যগণ গন্ধ তৈলযুক্ত প্রদীপ নিয়ে পথ দেখাতে লাগল।

উষ্ণীষকঞ্চুকধারী রক্ষিগণ বেত্র-হস্তে ধীরে ধীরে চারদিকের জনতা সরিয়ে দিল।

ভীষ্মের কাছে গিয়ে দুর্যোধন কৃতাঞ্জলি পুটে সাশ্রুনয়নে গদগদ কণ্ঠে বললেন, "শত্রুহন্তা পিতামহ, আমার প্রতি দয়া করুন। ইন্দ্র যেমন দানবদের বধ করেছিলেন আপনি সেইরূপ পাণ্ডবগণকে বধ করুন। আপনার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করুন। পাণ্ডব পাঞ্চাল কেকয় প্রভৃতিকে বধ করে সত্যবাদী হন। যদি আমার দুর্ভাগ্যক্রমে কৃপাবিষ্ট হয়ে বা আমার প্রতি বিদ্বেষের বশে আপনি পাণ্ডবদের রক্ষা করতেই চান, তবে কর্ণকে যুদ্ধ

করবার অনুমতি দিন। তিনিই পাণ্ডব-গণকে জয় করবেন।"

দুর্যোধনের কথায় বিদ্ধ হয়ে মহামনা ভীষ্ম অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হলেন। কিন্তু কোন অপ্রিয় বাক্য বললেন না। দীর্ঘকাল চিন্তার পর তিনি ধীর ভাবে মৃদু কণ্ঠে বললেন, "দুর্যোধন, আমাকে বাক্যবাণে পীড়িত করছ কেন, আমি যথাশক্তি চেষ্টা করছি। তোমার প্রিয় কামনায় সমরানলে প্রাণ আহুতি দিতে প্রস্তুত হয়েছি। পাণ্ডবগণ কিরূপ পরা-ক্রান্ত তার প্রচুর নিদর্শন তুমি পেয়েছ। খাণ্ডবদাহকালে অর্জুন ইন্দ্রকেও পরাস্ত করেছিলেন।"

কিছুক্ষণ দুর্যোধনের দিকে তাকিয়ে ভীষ্ম আবার বললেন, "তুমি নিশ্চয় ভুলে যাওনি যে তোমার বীর ভ্রাতারা আর কর্ণ যখন পালিয়ে ছিলেন তখন অর্জুন তোমাকে গন্ধর্বদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। বিরাট নগরের গোহরণ-কালে একাকী অর্জুন আমাদের সকলকে জয় করে উত্তরকে দিয়ে আমাদের বস্ত্র হরণ করিয়ে ছিলেন। শঙ্খচক্র গদাধর অনন্ত শক্তি সর্বেশ্বর পরমাত্মা বাসুদেব যাঁর রক্ষক সেই অর্জুনকে যুদ্ধে কে জয় করতে পারে? নারদাদি মহর্ষিগণ বহু-বার তোমাকে বলেছেন কিন্তু তুমি মোহবশে বুঝতে পারছ না। মুমূর্ষু লোক যেমন সকল বৃক্ষই কাঞ্চনময় দেখে তুমিও সেইরূপ। বিপরীত দেখছ। এই যে বিরাট শত্রুতা এর স্রষ্টা তুমি। তোমারই জন্য এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের অব-তারণা। যে যুদ্ধ তুমি নিজে ডেকে এনেছ সেই যুদ্ধে তুমি নিজেই তো পৌরুষ দেখাতে পার। বার বার আমাকে এভাবে প্রশ্ন করার কি সার্থকতা থাকতে পারে। নিজের কথা যদি আমাকে বলতেই হয় তাহলে বলব যে আমি সোমক পাঞ্চাল ও কেকয়গণকে শেষ করবই করব।

রাগে ক্ষোভে কাঁপতে কাঁপতে ভীষ্ম দুর্যোধনকে আরও বললেন, "শোন, আর তা যদি না করতে পারি তাহলে তাদের হাতে মৃত্যুবরণ করে যমালয়ে যাব। ওদের পরাজিত করে তোমাকে খুশী করার চেষ্টা করব। আর তা না পারলে আমার কপালে নরক ছাড়া অন্য কোন স্থান নেই।"

দুর্যোধন মাথা নিচু করে ভীষ্মের কথা শুনছিলেন।

ভীষ্ম আবার বললেন, "কিন্তু একটা কথা, আমি তোমাকে এ বিষয়ে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই, আমার প্রাণ গেলেও আমি শিখণ্ডীকে বধ করবো না। আমি তাকে বধ করতে পারি না। তুমি নিশ্চয়

জ্ঞান বিধাতা তাকে নারী রূপেই সৃষ্টি ক'রেছিলেন। তার নাম ছিল শিখণ্ডিনী।"

কিছুক্ষণ চুপকরে ভীষ্ম দুর্যোধনকে গম্ভীর গলায় বললেন, "শোন, আগামী কাল আমি এমন এক যুদ্ধ করার পরিকল্পনা করছি, এমন মহাযুদ্ধ করব যে যুগ যুগান্ত ধরে, চিরকাল বিশ্বের মানুষ সেই যুদ্ধের কথা বলবে। গান্ধারী পুত্র আর বিলম্ব না করে তুমি ঘুমের আয়োজন কর।"

ভীষ্মের কথা শুনে দুর্যোধন নত মস্তকে সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রণাম করে নিজের শিবিরে চলে গেলেন।

দুর্যোধনের চলে যাওয়ার পর ভীষ্মের নিজের উপরেই বিরক্তি জাগল। আত্মগ্লানিতে ক্ষত বিক্ষত চিত্তে ভীষ্ম নিজেকে নিজে তিরস্কৃত করতে লাগলেন।

নিশ্চিত পরাজয় জেনেও যুদ্ধ করা, এবং যুদ্ধ চলাকালীন বার বার দুর্যোধনের বিচিত্র কথা শোনা ভীষ্মের কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর লেগে ছিল। কিন্তু উপায় নেই। তিনি যে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। যুদ্ধ পরিচালনা তাঁকে করতেই হবে।

যুদ্ধের নবম দিন। ভীষ্ম সর্বতোভদ্র নামে এক মহাব্যূহ রচনা করলেন। এই ব্যূহের বিভিন্ন স্থানে থেকে যুদ্ধ করার ভার পড়ল কৃপ, কৃতবর্মা, জয়দ্রথ, দ্রোণ,

ভূরিশ্রবা, শল্য, ভগদত্ত ও দুর্যোধন প্রমুখের উপর।

পাণ্ডবগণ ও অন্য ধরনের এক মহাব্যূহ রচনা করে প্রচণ্ড এক যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিলেন। অর্জুন ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন, "পাঞ্চাল পুত্র, তোমার আজকের প্রধান কাজ হল শিখণ্ডিকে ভীষ্মের সামনে রাখা। তাকে অভয় দাও, আমি তার রক্ষক হব।"

সেইদিন সকালে দুর্যোধন তার পক্ষের রাজাদের বললেন, "আজ পিতামহ ভীষ্ম ভয়ঙ্কর এক যুদ্ধ করবেন।" তারপর দুঃশাসনের কাছে গিয়ে বললেন, "আজ আমাদের জয় নিশ্চিত। আজ আমাদের

প্রধান কর্তব্য ভীষ্মকে রক্ষা করা। এই কাজে শকুনি, শল্য, দ্রোণ, কৃপাচার্য প্রমুখ প্রত্যেককেই নিজের নিজের ভূমিকা পালন করতে হবে।"

রথে আরূঢ় হয়ে মহাবীর অভিমন্যু শরের আঘাতে আঘাতে কৌরব সেনাদের পর্যুদস্ত করতে লাগলেন। অভিমন্যু এমনভাবে যুদ্ধ করতে লাগল যেন দ্বিতীয় অর্জুন। অশ্বত্থামা কৃপাচার্য, দ্রোণ প্রমুখ মহাবীরগণ ছড়িয়ে পড়তে লাগলেন। এ রকম এক চরম অবস্থায় দুর্যোধনের আদেশে রাক্ষস অলম্বুষ তাকে বাধা দিতে গেল। সে তখন তামসী মায়া প্রয়োগ করল। ঘন অন্ধকারে সব ছেয়ে গেল। কেউ কাউকে দেখতে পেল না।

তখন অভিমন্যু এই অন্ধকারকে দূর করার জন্য ভাস্কর অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। তারপর অলম্বুষকে শরাঘাতে আচ্ছন্ন করলেন। অলম্বুষ ভীষণ ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

নবম দিনের যুদ্ধে একবার কৌরবদের একবার পাণ্ডবদের জয় হতে লাগল। শেষে ভীষ্মের প্রচণ্ড বাণ বর্ষণের ফলে পাণ্ডব সেনারা বিধ্বস্ত হতে লাগল। সেই মারাত্মক অবস্থায় বড় বড় যোদ্ধারাও অস্ত্র ফেলে পালাতে লাগল। মরা হাতী, ঘোড়া ও ভাঙ্গা রথে যুদ্ধক্ষেত্র ভরে গেল। সেনারা হতবাক হয়ে ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় হাহাকার করতে লাগল।

অন্যদিক থেকে ভগদত্ত গজ সেনা নিয়ে ভীমের উপর আক্রমণ করল। ভীম গদা নিয়ে রথ থেকে নেমে তাঁর চারদিকে যত গজ সেনা ছিল প্রত্যেককে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করতে লাগল। ভীমের আঘাত সহ্য করতে না পেরে গজ সেনারা পালিয়ে গেল।

ভীষ্ম ও পাণ্ডবগণের শর বর্ষণের ফলে নবম দিনে উভয় পক্ষের বহু সেনা বিনষ্ট হল। ভীষ্মের ভয়ঙ্কর অমানুষিক আক্রমণের ফলে পাণ্ডব সেনারা যে

যেদিকে পারল পালিয়ে গেল। তারপর সূর্যাস্ত হল। পাণ্ডব ও কৌরব গণ যুদ্ধে বিরতি দিলেন। যোদ্ধারা যে যার শিবিরে গেলেন। ভাইদের ভীষ্মের কাছে নিয়ে এসে নানা কথায় তাঁর প্রশংসা করলেন।

ভীষ্মের সেদিনের রুদ্র রূপ যুধিষ্ঠির কে ভাবিয়ে তুলেছিল। শিবিরে বিভিন্ন যোদ্ধাদের সঙ্গে সেদিনের যুদ্ধের বিষয়ে তিনি আলাপ আলোচনা করতে লাগলেন। তারপর তিনি কৃষ্ণকে বললেন, "হাতী যেমন নলবন মাড়ায় ভীষ্ম আজ সেই রকম মাড়িয়েছেন। ভীষ্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাওয়াই বোধ হয় উচিত হয়নি। কৃষ্ণ, আমি আবার ফিরে যাই বনে। তুমি এখন আমাদের এমন এক উপদেশ দাও যাতে স্বধর্মও থাকে আর আমিও শান্তিও পাই।"

কৃষ্ণ বললেন, "এত বিষণ্ণ কেন ধর্মপুত্র ? অর্জুন যদি ভীষ্মকে বধ করতে না চান আপনি সেই মহান কাজের ভার আমাকে দিন। আমি ভীষ্মকে বধ করব। আমার ভীষ্মকে বধ করার পর আর আপনার কোন শত্রু থাকবে না। মুস্কিল হল অর্জুন যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ভীষ্মকে বধ করার। এটা যে তাঁরই কর্তব্য।"

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, "কৃষ্ণ তুমি যদি আমাদের রক্ষা কর তাহলে আমরা ভীষ্ম কেন ইন্দ্রকেও জয় করতে পারব। তোমাকে মিথ্যাবাদী করার কোন ইচ্ছাই আমাদের নেই। কিন্তু আমি ভাবছি ভীষ্মের কথা। তিনি যে আমাকে কথা দিয়েছিলেন, দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করলেও তিনি আমার ভালর জন্য পরামর্শ দেবেন। আমরা সবাই তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে কিভাবে বধ করা যায় তা জেনে নিতে পারি। ক্ষত্রিয় জীবনকে ধিক্! আমি আমার পিতা-মহকে বধ করতে চাইছি।"

কৃষ্ণ খুশী হয়ে বললেন, "ভীষ্ম মহাবীর। একমাত্র তিনিই বলতে পারেন কিভাবে তাঁকে বধ করা যায়।"

মিত্রভেদ

সাত

জেলের বউ যে ভাবে সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য করল তা দেখে দেবশর্মা ভাবলেন, "বাব্বা, মেয়ে ছেলে কী ধূর্ত। ওদের বুদ্ধির কাছে শুক্রাচার্য ও বৃহস্পতিকেও হার মানতে হয়ে ছিল।"

সেই সময় নাপতিনী ভাবছিল সে ঐ কাটা নাক লুকোবে কি করে।

সারারাত রাজ মহলে কাজ করে ফিরে এসে নাপিত তার বউকে বলল, "এই শোন, আমার যন্ত্রপাতির থলিটা নিয়ে এসতো। শহরে যেতে হবে।"

নাপতিনীর এমনিতেই বেশি বুদ্ধি ছিল, নাক কেটে যাওয়ার পর তার বুদ্ধি যেন আরও অনেক গুণ বেড়ে গেল। তাই নাপিত অস্ত্র ভরা থলি চাইলে সে শুধু একটি অস্ত্র আড়াল থেকে ছুঁড়ে দিল। মুহূর্তে নাপিতের রাগ হল। সে ভাবল, "একি। চাইলাম সমস্ত অস্ত্র আর বউ দিল কি না একটি মাত্র অস্ত্র! একি কালা না কি!" রেগে গিয়ে নাপিত ঐ অস্ত্রটিকে ছুঁড়ে দিল। তৎক্ষণাৎ নাপতিনী আর্তনাদ করতে লাগল, "বাঁচাও, বাঁচাও, আমার দুষ্টপতি আমার নাক কেটে দিয়েছে!"

তার আর্তনাদ শুনে সেপাই ছুটে এল। নাপিতকে মারধোর করে, তাকে, তার বউ ও ঐ কাটা নাককে নিয়ে গেল ন্যায়াধিকারীর কাছে। সেখানে ওরা বলল, "এই দুষ্ট লোকটা নিজের বউ-এর নাক কেটে দিয়েছে। জঘন্য অপরাধ করেছে। কঠিন শাস্তি দেওয়া হোক।"

ন্যায়াধিকারী নাপিতকে বললেন, "তুমি এই অপরাধ কেন করলে? তোমার বউ এমন কোন্ অপরাধ করেছে যে

শেষ প্রচ্ছদ চিত্র

তুমি তাকে এত বড় শাস্তি দিলে ?"

নাপির এমনিতেই বোকা ছিল তার উপর হঠাৎ এই ঘটনা ঘটায় ও মার খাওয়ায় সে কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। সে কোন জবাব দিতে পারল না। নাপিতকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন ন্যায়াধিকারী। নাপিতকে যখন বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন খবর পেয়ে দেবশর্মা সেখানে গিয়ে ন্যায়াধিকারীকে বললেন, "মশাই, বেচারা নিরপরাধী নাপিতকে কেন মেরে ফেলছেন। আমি সত্য ঘটনা বলছি, শুনুন। অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে গিয়ে আমি, একটি শেয়াল ও নাপতিনী বিপদে পড়ে গেছি।"

"কি করে ?" ন্যায়াধিকারী জিজ্ঞেস করলেন। দেবশর্মা ভেড়াদের ঝগড়ার কাহিনী, নিজের সোনা হারানোর কাহিনী ও আষাড়ভূতির বিশ্বাসঘাতকতা এবং মাতাল জেলের কাহিনী শোনালেন।

ন্যায়াধিকারী দেবশর্মার সমস্ত কাহিনী মনযোগ দিয়ে শুনে নাপিতকে দণ্ড না দিয়ে ছেড়ে দেন। কিন্তু নাপতিনীকে ছোটখাট শাস্তি না দিয়ে ছাড়তে পারেন নি। নাপতিনীতো আগে থেকেই নাক হারিয়ে ছিল, তার কানও কেটে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। নাপতিনী কান হারাল।

শেয়াল ও নাপতিনী যে শাস্তি পেল তা দেখে দেবশর্মা ঠিক করলেন মঠে ফিরে যাওয়া। মঠে ফিরে এসে শিবকে দেবশর্মা বললেন, "হে মহাদেব, তোমার দয়ায় তিনের মধ্যে আমিই কম শাস্তি পেলাম। রক্তের তৃষ্ণা মেটাতে গিয়ে শেয়াল প্রাণ হারিয়েছে। নাপতিনী কান ও নাক হারিয়েছে আর আমি শুধু হারালাম সোনা। আমি আর কোন দিন সোনার চিন্তা করব না।"

দমনকের মুখে দেবশর্মার কাহিনী শুনে করটক বলল, "ভালকথা, এবার বল আমাকে কি করতে হবে ?"

তারপর, দমনক বুঝিয়ে বলল,

"আমাদের রাজা পিঙ্গলক ভুল পথে চলছেন। তাঁকে সঠিক পথে চালনা করতে হবে। আমাদের রাজার কোন পরামর্শদাতা নেই। এক ঘাস খেকোই হল আমাদের রাজার একমাত্র পরামর্শ-দাতা। এর ফলে আমাদের রাজার নীতি ও চালচলনও ঘাস খেকো হয়ে যাচ্ছে। ওঁকে এই পথ থেকে সরাতে হবে।"

"আমাদের মত দুর্বলদের পক্ষে এ কি করে সম্ভব?" করটক বলল।

"শরীরের ক্ষমতায় না কুলোলে বুদ্ধিতে জিততে হবে। কাজ হাসিল করার জন্য অতবড় ভয়ঙ্কর সাপকে কি মারেনি এক ক্ষুদ্র কাক সোনার মালার সাহায্যে?" দমনক জবাব দিল।

"জানিনা তো সে কাহিনী। বল শুনি।" করটক বলল। দমনক তখন বলল:

একটি কাক যে সাপ মেরে ছিল

কোন এক জায়গায় বিরাট এক বট গাছ ছিল। সেই গাছে এক জোড়া কাক ছিল। ঐ কাকের বাচ্চাদের এক সাপ খেয়ে ফেলত। অনেক দিন তারা এই নিয়ে অনেক ভেবেছে। কি করা যায়। কোথাও চলে যাবে কিনা। কিন্তু অন্য কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা করছিল না।

সাপ যথারীতি গাছে উঠত ও পাখনা না ওঠা কাকের বাচ্চাকে খেয়ে ফেলত।

শেষে মেয়ে কাক পুরুষ কাকের পায়ে পড়ে অনুরোধ করল, "নাথ, দুষ্ট সাপ আমাদের বাচ্চাদের খেয়ে ফেলছে। আমি যে বাচ্চাদের পেটে ধরব তারা সবাই কি চিরকাল সাপের পেটেই যাবে? তার চেয়ে চল আমরা অন্য কোন গাছে গিয়ে বাসা বাঁধি। তোমার কি দুঃখ হয় না? এভাবে বাচ্চাদের হারিয়ে আমরা নিঃসন্তান থাকব? আর মা হয়ে সন্তান হারানোর যে কি ব্যথা তা তুমি বুঝবে কি করে?"

এ কথায় পুরুষ কাক বলল, "আমরা আজ কত কাল ধরে এই গাছে আছি। এক মুঠো ঘাস আর এক আঁজলা জল

খেকো হরিণ যে কোন জায়গায় বাঁচতে পারে কিন্তু সে জন্মস্থান ছেড়ে অন্য কোথাও যায় না। হরিণের বুদ্ধি নেই তবু সে জন্মস্থান ছাড়ে না আর আমরা বুদ্ধি রাখি তবু সরে যাব? জন্মস্থান ছেড়ে পালিয়ে যাব? আমি যে কোন ভাবে ঐ দুষ্ট সাপকে মেরে ফেলব।"

"ওবাবা, ওযে জাত সাপ। ভয়ঙ্কর বিষ তার দাঁতে। তাকে তুমি মারবে কি করে?" মেয়ে কাক বলল।

মেয়ে কাকের দিকে তাকিয়ে পুরুষ কাক আবার বলে, "জন্মভূমি অত সহজে ছাড়া যায় না। যারা ভীরু, যাদের জন্ম-ভূমির প্রতি টান নেই একমাত্র তারাই সাধারণ ব্যাপারে ভীত হয়।"

"যারা খাওয়ার জন্য বাঁচে একমাত্র তারাই জন্মভূমি ছেড়ে অহেতুক ভয়ে পালানোর কথা ভাবতে পারে। আমরা তো বাঁচার জন্য খাই। আগে চেষ্টা করে দেখি।" বলল পুরুষ কাক।

"আমি নিজেই যে মারব তার কি মানে আছে। ধর্ম ও রাজনীতির শাস্ত্রে মহান পণ্ডিত উদ্দণ্ড আমার বন্ধু। আমি তার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে যে ভাবে মারা উচিত সেই ভাবেই মারব।" পুরুষ কাক দৃঢ়তার সঙ্গে বলল।

পুরুষ কাক এ কথা বলে সেখান থেকে উড়ে গিয়ে অন্য গাছের নিচে গেল। সেখানে থাকত তার বন্ধু এক শেয়াল। তাকে বলল, "হে মিত্র, আমার বাচ্চাদের যে সাপ খেয়ে ফেলছে, তাকে মেরে ফেলার কোন উপায় থাকলে বল।"

এ কথায় বলল, "আমি ভাল উপায় ভেবেছি। কাজে লাগবে। তোমার কোন ভাবনা নেই। যে খারাপ কাজ করে সে নদীর তীরের গাছের মত নিজেই পড়ে যায়। প্রাচীনকালে এক বক অনেক মাছ খেয়েও তৃপ্ত হয়নি। শেষে তার মৃত্যু এক সাধারণের হাতে হল। সে কাহিনী কি তুমি জাননা?"

"না তো? কোন্ সে কাহিনী? শোনাও তো।" পুরুষ কাক বলল।

ইঙ্কের মন্দির

দক্ষিনপেরুর অ্যান্ডিস পাহাড়ের মাঝে ইঙ্কা জাতির রেড ইন্ডিয়ানরা যে থাকত সে কথ ইতিহাস বিধৃত। স্প্যানিশের লোক যখন তাদের পরাজিত করল তখন তারা বনে পালাল ছবিতে ওদের তৈরি একটি ভগ্ন মন্দির দেখা যাচ্ছে।

ফটো : ব্রজ দেব

পুরস্কৃত নাম

আদরে উছল হাসি

পুরস্কার পেলেন
অণিমা মুখোপাধ্যায়

ফটো : এম্. নটরাজন্
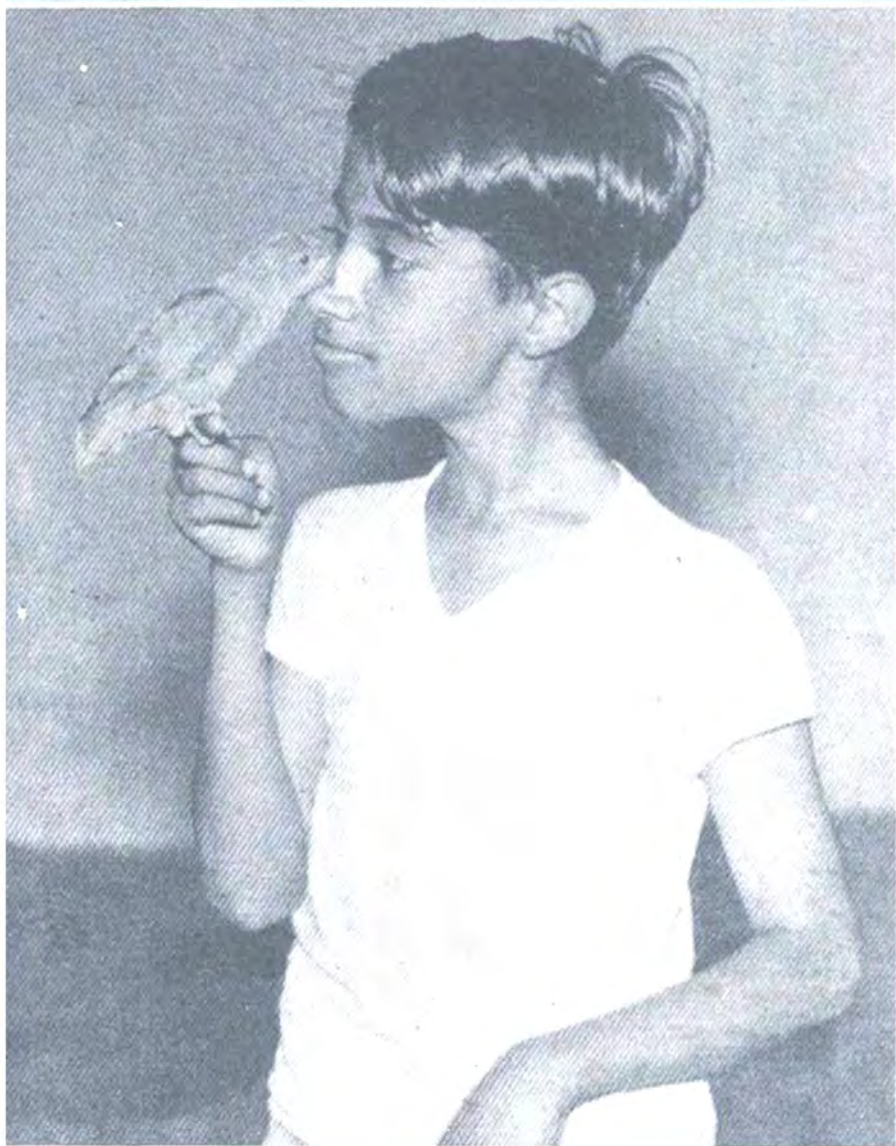
৪সি, মনোহর পুকুর রোড
কলিকাতা-২৬

পাখিওতো ভালবাসি

পুরস্কৃত
নাম

ফটো নামকরণ প্রতিযোগিতা :: পুরস্কার ২০ টাকা

★

★ ফটো-নামকরণ ২০শে মার্চ'৭৪ এর মধ্যে পৌঁছানো চাই।

★ ফটোর নামকরণ দুচারটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই এবং দুটো ফটোর নামকরণের মধ্যে ছন্দগত মিল থাকা চাই। নিচের ঠিকানায় পোস্ট-কার্ডেই লিখে পাঠাতে হবে। পুরস্কৃত নাম সহ বড় ফটো মে'৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

চাঁদমামা

এই সংখ্যার কয়েকটি গল্প-সম্ভার

অমরবাণী	৮	গুরুর পদ	৩৩
যক্ষ পর্বত	৯	সোমনাথের বুদ্ধি	৩৬
দেবতার রাগ	১৭	বিদেশী ব্যবসায়ী	৪৪
স্ত্রীর পরামর্শ	২৪	কাজের জোগাড়	৪৭
সবার উপরে	২৭	মহাভারত	৪৯
সাত ঘড়া সোনা	৩১	মিত্রভেদ	৫৭

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ চিত্র

মরসুমী ফসল

তৃতীয় প্রচ্ছদ চিত্র

আখের স্বাদ মিষ্টি

Printed by B. V. REDDI at The Prasad Process Private Ltd., and Published by B. VISWANATHA REDDI for Chandamama Publications, 2 & 3, Arcot Road, Madras-600026. Controlling Editor: 'CHAKRAPANI'

Photo by: P. V. SUBRAMANYAM

মিত্রভেদ